জীবন জাগার গল্প - ৯

কোঁচড় ভরা মান্না

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ।

শিক্ষক পিতা ও গৃহিনী মায়ের চতুর্থ সন্তান। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাহাড়ঘেরা পার্বত্য জনপদে। বনবাদাড়ের ভয়জাগানো আদিম আবহাওয়ায়। স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদীর বিক্ষুব্ধ স্রোতে সাঁতার খেলে। বহু উপজাতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় সমাজে। পিত্রালয় ও মাতুলালয় ফেনীর ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে। পড়াশোনার সূত্রে সময় কেটেছে গ্রামবাঙলার নিটোল পল্লীর গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাচীন ধারার কওমী মাদরাসার আমলি পরিবেশে।
পড়াশোনার হাতেখড়ি বাবা ও মায়ের কাছে। মাদরাসাজীবন কেটেছে, মামা মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী (দা বা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি হাকীমুল উম্মতের অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর খাস সোহবতপ্রাপ্ত। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম।
ফলে মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ বেড়ে উঠেছেন খানকাহী মেজাজে, সুনিপুণ তরবিয়তের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।
নব্বইয়ের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসক ও শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে সৃষ্ট হওয়া টানটান উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, তার মনমননে গভীর রেখাপাত করেছে। পাশাপাশি এই দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, আফগান জিহাদ তাকে দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক চেতনা। বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার আছে গভীর পাঠ।
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে তিনি তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) সমাপ্ত করেছেন। কুরআনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম প্রতিষ্ঠা করে। যার অন্যতম লক্ষ্য কুরআনের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ স্বভাবগতভাবে নিভৃতচারী হলেও কাছের মানুষরা জানে তিনি বেশ রসিক মানুষ। বই পড়া তার পেশা ও নেশা। অনলাইনে পঞ্চাশেরও অধিক শিরোনামে ধারাবাহিক লেখা লিখে চলছেন বিরামহীনভাবে।
তার লিখিত জীবন জাগার গল্প সিরিজের লেখাগুলো বেশ সুখপাঠ্য। পাঠক অবচেতনমনেই আকৃষ্ট হয় কুরআনের প্রতি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখাগুলো আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে গাফলাতের সুখনিদ্রা থেকে। উদ্বুদ্ধ করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তাঁর কলমকে আরও শাণিত করুন। গোটা বিশ্বকে কুরআনি আলোয় আলোকিত করুন।

—প্রকাশক

াযহার

শুরুর কথা

মান্না? বনী ইসরাঈলের সেই মিষ্টির কথা বলছি! আকাশ থেকে নেমে আসতো! মধুর মতো মিষ্টি! জমাটবাঁধা একপ্রকার মিষ্টান্নদ্রব্য। শিশিরবিন্দুর মতো আকাশ থেকে ঝরে পড়তো! পেঁজাতুলার মতো! দৃশ্যকল্পটা বেশ সুন্দর! শিমুল তুলা যখন পেকে যায়, তুলার ফলটা ফেটে যায়! বাতাস সেই তুলাকে আকাশময় উড়িয়ে বেড়ায়। ছেলেপিলের দল দৌড়াদৌড়ি আর ছোটাছুটি করে তুলা ধরার খেলা শুরু করে। কাটা খাওয়া ঘুড়ির পেছনে যেভাবে হৈ রৈ করে ছোটে, তুলা শিকার করার জন্যও শিশু-কিশোরের দল ছোটে!

❖

মান্না ঝরে পড়তো রাতের বেলায়! বনী ইসরাঈল সকালে ঘুম থেকে উঠেই মান্না কুড়োতে যেতো! কী আরাম! বেড-টির মতো! ঘুম থেকে জেগেই খাবারের বন্দোবস্তি! তারা 'মান্না' কিভাবে সংগ্রহ করতো? হাতে করে? পাত্রে করে? নাকি গ্রামের ছোট্ট মেয়েটির মতো 'কোঁচড়ে'? মা চাল ভেজে দিলেন বা বাউলা টেলে দিলেন বা খই ভেঙে দিলেন! খুকি সেটাকে মুঠো ভরে হাফফ্যান্ট বা পায়জামার কোঁচড়ে ভরে, উঠোনে বসে বসে খেতে থাকে! বনী ইসরাঈল কিভাবে খেতো?

❖

মান্নার স্বাদ মধুর মতো ছিল। আমাদের গল্পগুলোও কি মিষ্টি? এ কেমন প্রশ্ন? গল্প কি খাবার জিনিস যে মিষ্টি হবে! আরে মিষ্টি কি শুধু জিহ্বা দিয়ে চাখা যায়? মনের জিহ্বা দিয়ে চাখা যায় না? কেন যাবে না! অবশ্যই যাবে!

❖

মান্না ঝরে পড়তো আকাশ থেকে! বইয়ের গল্পগুলো? এগুলো কোত্থেকে ঝরে? মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে! লেখকদের লেখা থেকে! বুড়ো দাদুর জীবনাভিজ্ঞতা থেকে! মাঝির নৌকার গুন থেকে! পাখির বাসা বোনা থেকে! পুকুরে মাছের ঘাই থেকে!

❖

দৈনন্দিন জীবনে ঝরে পড়া গল্পগুলোর স্বাদ এক রকম হয় না। কোনওটার স্বাদ মিষ্ট! কোনওটার স্বাদ তিক্ত! কোনওটা হাসির! কোনওটা কান্নার! কোনওটা আনন্দের! কোনওটা বেদনার! নানা স্বাদের, নানা রঙের গল্প নিয়েই একটা জীবন!

❖

সব সময় এক স্বাদ কি ভালো লাগে? জীবনে কোনও দুঃখ এল না, জীবনে শুধু সুখ আর সুখ! আয় সুখ, যায় সুখ! তাহলে জীবনটা আলুনি হয়ে যেতো না! বাঁচার ইচ্ছেটা, সংগ্রাম করার দমটাই মরে যেতো না! এজন্যই কি বনী ইসরাঈল প্রতিদিন একস্বাদের 'মান্না' খেয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিল! মুসা আ.-কে বাধ্য করেছিল: আল্লাহর কাছে দু'আ করতে? যেন এমন মহার্ঘ্য খাবার বদলে দেয়া হয়? আন্দোলন করে খাবার? 'কাবিখা'ধর্মী কিছু? এখন আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি! কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি! প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি! কিন্তু দুষ্ট বেয়াড়া বনী ইসরাইল সরাসরি 'আল্লাহর' বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল! না না, আমাদের কোনও আন্দোলন নেই। গল্প-আন্দোলন? গল্প চাই! গল্প চাই! এই দাবীতে সোচ্চার হয়ে রাজপথ কাঁপানো? হ্যাঁ, গল্পের জন্যে আন্দোলন চলতে পারে! তবে সেটা রাজপথ কাঁপিয়ে নয়! আন্দোলনটা হবে, মেধাকে ঝাঁকিয়ে! বিভিন্ন লেখকের বইকে ফাঁকিয়ে!

❖

বনী ইসরাঈলের একটা বদ-স্বভাব ছিল! তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মান্না কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে রেখে দিত! অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিকের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বজ্জাত বনী ইসরাইল আল্লাহ তা'আলাকে থোড়াই কেয়ার করতো! নাউযুবিল্লাহ! তারা ঘরে নিয়ে যেসব মান্না রেখে দিত, সেসবের স্বাদ কি পরদিন আগের মতো থাকতো? আসমানী খাবার বাসি হওয়ার কথা নয়! তবুও মনে হয়, দুনিয়াতে আসার পর, সেসব খাবারে দুনিয়ার ছোঁয়া লাগিয়ে দিতেন আল্লাহ তা'আলা!

❖

তাহলে কি বলতে চাচ্ছি: গল্পেরও তাজা-বাসি হওয়ার ব্যাপার আছে? একটা গল্প কতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকে? কতোটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একটা গল্প জুড়িয়ে যায়? ঠাণ্ডা হয়ে যায়? গল্পটা লেখা হওয়ার পর কতক্ষণ গরম থাকে? গল্পটার জন্মই বা কখন হয়? যখন মাথার দূরতম কোণে, ভাবটা বীজ হয়ে ধরা দেয় তখন, নাকি কাগজের পাতায় প্রস্ফুটিত হওয়ার পর? গল্প গরম হোক আর ঠাণ্ডা হোক, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় হলো, গল্পের শিক্ষাটা! গল্পটা পড়ার পর, নিজের ভেতরে জন্ম নেয়া আবেগটা! গল্প শেষ করার পর, ভেতরে কুলকুলিয়ে ওঠা হাহাকারটা!

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৪৮৭

আটটি 'লাভ'!

ফজরের নামাযে আটটি লাভ।

প্রথম লাভ

ফজরের নামাযে দাঁড়ানো, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান,

= যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ইশার নামায আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়লো, সে যেন পুরো রাত জেগে নামায পড়লো (মুসলিম)।

.

দ্বিতীয় লাভ

সেদিনের পুরোটা আল্লাহর যিম্মায় থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য। ফজরের নামায পড়লেই শুধু এ-ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য লাভ করা যাবে।

= যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়বে, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকবে (মুসলিম)।

.

তৃতীয় লাভ

ফজরের নামায কেয়ামতের দিন নূর হয়ে দেখা দিবে।

= যারা রাতের আঁধারে মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ 'নূর' প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও (আবু দাউদ)।

.

চতুর্থ লাভ

সরাসরি জান্নাত প্রাপ্তি। শুধু ফজরের নামাযটা পড়লেই হবে।

= যে ব্যক্তি দুই শীতল (নামায) পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর দুই শীতল (নামায) হলো ফজর ও আসর (বুখারী)।

পঞ্চম লাভ

রিযিকে বরকত আসবে। ফজর নামাযটা পড়লেই হবে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন:

-সকাল বেলার ঘুম ঘরে রিযিক আসতে বাধা দেয়। কেননা তখন রিযিক বণ্টন করা হয়।

.

ষষ্ঠ লাভ

ফজরের নামায পড়লে, দুনিয়া আখেরাতের সেরা বস্তু অর্জিত হয়ে যাবে।

= ফজরের দুই রাকাত নামায, দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ (তিরিমিযী)।

.

সপ্তম লাভ

সরাসরি আল্লাহর দরবারে নিজের নাম আলোচিত হবে।

= তোমাদের কাছে পালাক্রমে দিনে ও রাতে ফিরিশতারা আসে। তারা আসর ও ফজরের সময় একত্রিত হয়। যারা রাতের কর্তব্যে ছিল তারা ওপরে উঠে যায়। আল্লাহ তো সব জানেন, তবুও ফিরিশতাদেরকে প্রশ্ন করেন:

-আমার বান্দাদেরকে কেমন রেখে এলে?

-আমরা তাদেরকে নামাযরত রেখে এসেছি। যখন গিয়েছিলাম, তখনো তারা নামাযরত ছিল (বুখারী)।

.

অষ্টম লাভ

ফজরের নামায দিয়ে দিনটা শুরু করলে, পুরো দিনের কার্যক্রমের একটা বরকতময় সূচনা হবে।

= হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে, তার সকাল বেলায় বরকত দান করুন (তিরমিযী)।

.

এজন্যই দিনের শুরুটা ভাল কিছু দিয়ে শুরু করা মানেই হলো, ফজর নামাযটা পড়া। আরও ভাল হয় যদি তাহাজ্জুদ দিয়ে শুরু করা যায়।

জীবন জাগার গল্প : ৪৮৮

বিয়ের খরচা!

-আপনি আজ জুমার বয়ানে বিয়ের কথা বলেছেন। আপনি যা বলেছেন, হুবহু ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে।

-তাই, সত্যি কী ঘটেছিল বলুন তো শুনি!

-আমার বয়েস তখন চব্বিশ। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। ভাইবোন সবার বিয়ে হয়ে গেছে। আব্বু-আম্মু ছিলেন না। আমার বিয়ে নিয়ে বড় ভাইবোনদের অতটা চিন্তাও ছিল না। যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত! পড়াশোনা শেষ করে চাকুরি নিলাম এক তেল কোম্পানীতে। বিদেশী সংস্থা হওয়াতে অনেক নারী কর্মীও আমার কলিগ ছিল। তাকওয়া বজায় রাখাই মুশকিল। অসম্ভবও বলা যায়।

বুঝতে পারছিলাম, বিয়ে করাটা ভীষণ জরুরী। ভাইবোনদের কাছে বলেও তেমন সাড়া পেলাম না। যে বেতন পাই, তা দিয়ে বিয়ের খরচা চালানো কঠিন। অনেক চিন্তা করলাম। অফিসে গেলেই আশেপাশে গুনাহের অতি সহজ উপকরণ হাতছানি দিয়ে ডাকে। একটু হ্যাঁ বললেই হয়। এক বন্ধুর সাথে পরামর্শ করলাম। সে আমাকে একটা হাদীস শুনিয়ে উৎসাহ দিলো।

= তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করার আল্লাহর ওপর কর্তব্য হয়ে পড়ে:

(এক) আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।

(দুই) যে দাস, নিজের মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে মনিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

(তিন) চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা ব্যক্তি।

.

হাদীসটা শুনে মনে বড় সাহস সঞ্চার হলো। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিয়ের খরচটা ধার নিলাম। তিন বছরে পরিশোধ করার শর্তে। বিয়ে হয়ে গেলো। ছুটি শেষে অফিসের কাজে যোগ দিলাম। সবার মুখে একটা কথা, আমাদের আগের বস বদলী হয়ে নতুন বস আসছেন।

নতুন বস এসে কোম্পানীতে নতুন ধারা চালু করলেন। আগে আমরা নির্দিষ্ট একটা বেতন পেতাম। মাঝেমধ্যে বোনাসও মিলত। ওভারটাইম পাওয়া যেতো কখনো। টেনেটুনে ১৫০০ রিয়াল হতো। বস বললেন, –আমরা যদি ভাল কাজ দেখাতে পারি। তাহলে বেতনের পাশাপাশি, কোম্পানীর লভ্যাংশ থেকেও একটা অংশ আমাদেরকে দেয়া হবে।

.

আমরা তুমুল উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কেউ কেউ রাতের ঘুম ছাড়া বাকি সময় কোম্পানীর কাজেই দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। হু হু করে আমাদের বিভিন্ন প্রডাক্ট বিক্রি হতে লাগলো। প্রতিমাসে বেতন-ভাতা মিলিয়ে গড়ে ৩ থেকে চার হাজার রিয়াল পেতে শুরু করলাম।

.

ছয়মাসেই আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলো। আমাদের বসের কাজে কোম্পানী সন্তুষ্ট হয়ে প্রমোশন দিলো। তাকে বদলী করা হলো অপেক্ষাকৃত অচল এক ব্রাঞ্চে। সেখানেও যেন কোম্পানী ভাল করতে পারে এই উদ্দেশ্যে। আগের পুরনো বস আবার ফিরে এলেন। তিনি হিংসার কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক নতুন ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। পুরানো বেতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন।

.

আমি অবাক হয়ে ভাবি, আল্লাহ কি আমার জন্যেই এই ব্যবস্থাটা করেছিলেন? তিনি কুরআনে বলেছেন:

= তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর: ৩২)।

জীবন জাগার গল্প : ৪৮৯

প্রেমরোগ!

মেয়েটা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাড়া-মহল্লার কোনও ডাক্তারই রোগটা ধরতে পারছে না। ওষুধ-বড়ি কিছুই কাজে আসছে না। হোমিওপ্যাথি-এলোপ্যাথি সব শেষ। একজন খবর দিল ওমুক শহরে এক বয়োবৃদ্ধ হেকিম আছেন। তিনি আগে শিরা ধরে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। এখন বয়েস হয়েছে, চোখে দেখতে পান না। আপাততঃ ঘরেই থাকেন। বাইরে কোথাও যান না। তাকে একবার এনে দেখানো যেতে পারে।

অভিবাবকরা পরামর্শ করে হেকিম সাহেবকে আনার ব্যবস্থা করলো। মেয়েটা তখনো অর্ধচেতন। প্রায় সংজ্ঞাহীন। হেকিম সাহেব শিরা ধরে বুঝতে পারলেন: মেয়ের শরীরে কোনও রোগ নেই। সম্পূর্ণ নীরোগ। কিন্তু মেয়েটা বড়ই নিস্তেজ হয়ে আছে। চোখ গর্তে ডুবে গেছে। কোনও রকমে বেঁচে আছে। এভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে।

.

হেকিম সাহেব যৌবনে এই এলাকাতেই চিকিৎসা করতেন। তাই তার এদিকের সব ঘরবাড়ি চেনা আছে। তিনি মেয়েটার কানের কাছে এক এক করে শহরের বিভিন্ন মহল্লার কথা উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। অভিবাবকরা অবাক। বুড়ো হেকিম পাগল হয়ে গেলেন না তো!

হেকিম সাহেব ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে মেয়ের শিরা ধরে, পাড়া-মহল্লার নাম আউড়ে যেতে লাগলেন। একটা মহল্লার নাম কানে যেতেই মেয়ের শিরা রক্ত চলাচল বেড়ে গেলো।

.

হেকিম সাহেবের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি এবার ওই এলাকার বিভিন্ন বাড়ির নাম উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। একটা বাড়ির নাম আসতেই মেয়ের পালস রেট আরও বেড়ে গেলো।

.

হেকিম সাহেব এবার এক এক করে সে বাড়ির বিভিন্ন যুবকের নাম বলতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পর, একটা নাম শোনার সাথে সাথে মেয়ের পালস রেট সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে গেলো।

হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন,

-মেয়েকে অমুক বাড়ির অমুক ছেলের সাথে বিয়ে দাও! সব ঠিক হয়ে যাবে! আর এই পুরিয়াটা খাইয়ে দাও। এক ঘণ্টা পরেই সে চেতনা ফিরে পাবে। তখন মেয়ের মা তাকে বিয়ের সংবাদটা দিবে। তাহলে আর কোনও ওষুধ লাগবে না।

জীবন জাগার গল্প : ৪৯০

বকেয়া!

মুদি দোকানদার বসে বসে মাসিক হিশেব মেলাচ্ছেন। আগামীকাল মাসের এক তারিখ। পাড়ায় কার কাছে কত পাবেন তার হিশেব করছেন। বকেয়া আদায় না হলে, আর বাকী দেয়া হবে না। এটাই নিয়ম। দোকান চালু হওয়ার পর থেকেই নিয়মটা চলে আসছে। সন্ধ্যা থেকে অনেকেই বকেয়া পরিশোধ করে গেছে।

পরদিন সকালে এক বৃদ্ধা দোকানে এলো। ভেতরে না এসে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। যারা সদাই করতে এসেছিল, একে একে সবাই চলে গেছে। তারপরও বুড়ি বাইরে! দোকানদারের চোখ পড়লো। সহাস্যে ডাক দিল:

-বুড়িমা! আপনি বাইরে কেন?

-বাবা! ঘরে চাল নেই আজ তিনদিন! পানি খেয়ে কাটিয়েছি! অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজেও যেতে পারিনি! মাস শেষ। টাকাও নেই! তোমার কাছে অনেক টাকা বকেয়া পড়ে গেছে! তোমার কাছে কিভাবে নতুন বাকী চাই! এই ভয়ে আসিনি। বাবা, আর পারছি না, তুমি একপোয়া চাল হলেও বাকি দাও! আমি সব টাকা শোধ করে দেব! ছেলে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। নইলে বুড়ো বয়েসে না খেয়ে থাকতে হয়?

-আপনার ছেলে বাড়ি আসেনি?

-না। সে বউ নিয়ে সেই কবে শহরে চলে গেছে! প্রথম কয়েক মাস টাকা পাঠিয়েছিল। তারপর আর খবর নেই।

-কী আশ্চর্য! আপনি বলছেন, আপনার ছেলের সাথে কোনও যোগাযোগ নেই!

-নেই তো! কেন বাবা!

-তাহলে গতরাতে আপনার পেছনের বকেয়া পরিশোধ করলো কে?

-কী বলছো তুমি! ছেলে এলে আমি জানতে পারতাম না!

-সত্যি বলছি! একলোক এসে বললো: বাকির খাতাটা দেখতে চাই! আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম বলে চেহারা খেয়াল করিনি! ভেবেছিলাম পাড়ার কেউ হবে। বাকি পরিশোধ করতে এসেছে! মাসের শেষদিন অনেকেই এভাবে আসে! আমি চুপচাপ খাতাটা এগিয়ে দিয়েছিলাম! লোকটা কিছুক্ষণ খাতা দেখলো। তারপর আপনার নামে টাকা জমা করলো। অতিরিক্ত আরও কিছু অগ্রিমও রেখে গেছে! শুধু তাই নয়, আমার কাছে জানতে চেয়েছে: এলাকায় সবচেয়ে গরীব কে? আমি আপনার নাম বলেছি। আরও কয়েকজনের নাম দিতে বললো। আমি খাতার বাইরে ছিল এমন কয়েকজনের নামও দিয়েছি! লোকটা সবার ঠিকানা লিখে নিল! এই যে এখানে ফোন নাম্বারও দিয়ে গেছে!

-বাবা নাম্বারটা একটু ধরে দেবে?

-অবশ্যই! এই নিন!

-হ্যালো!

-জ্বি, আপনি কে বলছেন?

-জা'ফর! আমি তোর মা! তুই গতকাল গ্রামে এখানে এসেছিলি?

-ও! বুঝতে পেরেছি! না বুড়িমা! আমি জা'ফর নই। তবে হাঁ, আমি আপনাদের ওখানে গিয়েছিলাম! আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বুড়িমা! আমরা কয়েকজন মিলে এবার থেকে নিয়মিত আপনাদের খেদমত করবো ইনশাআল্লাহ!

-ইয়া আল্লাহ! বাবারে! তুমি যে আমার পেটের সন্তানের চেয়েও.......!

জীবন জাগার গল্প : ৪৯১

আপন-পর

-শোন! নতুন বাসা নেয়ার পর আলাদা করে আব্বা-আম্মা-ভাইবোনদেরকে তো কখনো দাওয়াত দেয়া হয়নি! পাশাপাশি বাসা হওয়াতে মনেও আসেনি। আগামী ছুটির দিনে সবাইকে দাওয়াত দিলে কেমন হয়?

-খুউব ভালো হয়!

-ঠিক আছে! তাই হবে!

***

রাতে বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। একটা কাজে অনেক দূর যেতে হয়েছে। সকালে উঠেই স্বামীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন:

-সব আয়োজন ঠিকঠাক আছে তো!

-কিসের আয়োজন?

-দাওয়াত? গতকাল বাজার করে দিয়ে গেলাম যে!

-ও! তাদের জন্যে বাড়তি আয়োজনের কী দরকার! তারা তো মেহমান নন!

-মেহমান নন! তবে কী?

-তারা ঘরের মানুষ! আমরা যা খাই, তারাও তাই খাবেন!

-তুমি বুঝতে পারছো না বিষয়টা! এত আগ্রহ করে সবাইকে দাওয়াত দিলাম! এখন কী করি! সবাই এখানে সকালের নাস্তা করবেন!

***

স্বামী ভীষণ বিচলিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো! কিছুক্ষণ পরেই দরজায় জোরালো টোকা। স্ত্রী দরজা খুলেই আক্কেলগুড়ুম! তার আপন বাবা-মা, ভাই-বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে!

-তোমরা আসবে সেটা জানাওনি যে আগে!

-জামাই দাওয়াত দিয়ে বললো, তোকে না জানাতে!

***

-হ্যালো! তুমি কোথায়?

-এই তো, রাস্তায় হাঁটছি!

-এদিকে তো সব্বোনাশ হয়ে গেছে! তুমি আমার আব্বু-আম্মুকে দাওয়াত দিয়েছ সেটা আগে বলোনি যে!

-তোমাকে 'সারপ্রাইজ' দিতে চেয়েছিলাম।

-এখন কী করি! ঘরে মেহনমানদের আপ্যায়ন করার মতো কিছুই রান্না করা নেই! দোকান থেকে কিছু নিয়ে আসো না!

-মেহমান কোথায় দেখলে! তারা তো ঘরের মানুষ! আমরা যা খাই তারাও তাই খাবেন!

-ওগো আমার ভুল হয়ে গেছে!

-ঠিক আছে! কোনও চিন্তা করো না। এখন ফোন রেখে দরজাটা আল্লাহর ওয়াস্তে খোল!

জীবন জাগার গল্প : ৪৯২

দাদুর শেষ ইচ্ছা!

ছেলে প্রায়ই তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাইরে খেতে যায়। বৃদ্ধা মাকে ঘরে রেখে যায়। ছেলে মনে করেছে মা বুড়ো মানুষ, হোটেলে খেতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তাই কোনওদিন সেধেও দেখেনি। একদিন ছেলে বায়না ধরলো:

-দাদুকেও আজ সাথে নিয়ে যেতে হবে!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুড়ো মাকে সাথে নিতে হলো। হোটেলে খেতে গিয়ে মায়ের খুশি আর ধরে না। নাতির সাথে মিলে খুবই আনন্দের সাথে সবকিছু চেটেপুটে খেলেন। ছেলেকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

-হ্যাঁরে খোকা! একবার হোটেলে খেলে কতো টাকা বিল আসে?

-ওটা জেনে তোমার কী লাভ?

-তবুও বল না শুনি!

-ওটা নির্ভর করে খাওয়ার ওপর। এই ধরো আজ বিল এসেছে প্রায় বারোশ টাকা!

কিছুদিন পর মা মারা গেলেন। মৃতুশয্যায় একদিন ছেলে-বউমা-নাতিকে ডেকে বললেন:

- আলমারিতে একটা ছোট বাক্স পাবে। আমি মারা যাওয়ার পর সেটার মালিক হবে আমার দাদুভাই! আর কেউ নয়।

.

ঘরের সবাই কৌতূহলী হয়ে বাক্সটা খুলে দেখলো। বেশ কিছু টাকা আছে, আর একটা চিরকুট। তাতে লেখা,

-ভাই! তুমি যখন এইটা পড়বে, তখন আমি তোমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিছু টাকা রেখে গেলাম, আরও বেশ কিছু টাকা আমি আর তোমার দাদাভাই তোমার জন্যে আলাদা করে রেখেছি! তুমি যখন বড় হবে, সেগুলো দিয়ে তোমার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করবে। ফাঁকে ফাঁকে তাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাবে! মাঝেমধ্যে বাইরে কোথাও খেতে নিয়ে যাবে! তোমার কারণে আমি এই বৃদ্ধ বয়েসেও একদিন মনের আনন্দে ঘুরতে পেরেছি, বাইরে খেতে পেরেছি! আমার খুবই ভাল লেগেছে! আমাকে যেমন আনন্দ দিয়েছো, বাবা-মাকেও তেমন আনন্দ দিও কেমন! মনে থাকবে তো!

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৩

লজ্জাবতী নার্স!

শায়খ হুয়াইনি কাতারে এলেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। সাথে আছে বড় ছেলে হাম্মাম হেজাজী। হাম্মাম লিখেছেন,

-আমাদের হাসপাতালে বিভিন্ন দেশের ডাক্তার-নার্সরা কর্মরত আছে। দেশটা আরব হলেও, কর্মচারীদের বেশির ভাগই অনারব। অবশ্য পাকিস্তান-ভারতের মানুষই বেশি।

আব্বার দেখাশোনার জন্যে একজন ভারতীয় নার্স, প্রতিদিন বিকেলের পিরিয়ডে আসতো। আব্বা খুবই বিব্রত বোধ করতেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। মেনে নিতে হয়েছে।

আব্বা একটা বিষয়ে অবাক হতেন, মেয়েটা ভারতীয়, কিন্তু তার কথাবার্তা, আদব-লেহায, নিপুণ সেবা, শান্তসৌম্য আচরণের কারণে সবাই মুগ্ধ। তার মাথায় স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা স্কার্ফ দেখে আমরা প্রথম প্রথম মনে

করেছিলাম, সে কোনও মুসলিম দেশ থেকে এসেছে। পরে কথা বলার পর ভ্রম দূর হয়েছে। সে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু।

আব্বা একদিন কথা প্রসঙ্গে নার্সটার আলোচনা ওঠালেন। বললেন,

-মেয়েটা কতদূর দেশে থেকে এসেছে। এখানেও রাতদিন ডিউটি করছে। মানুষের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে। হাড়ভাঙা খাটুনি করছে দুটো পয়সার মুখ দেখবে বলে।

কিন্তু মেয়েটাকে দেখলেই আমার খারাপ লাগে। এত গুণী একটা মেয়ে, ঈমানের দেশে এসেও ঈমানের দেখা পেল না! কেউ তাকে হয়তো বলেইনি! দাওয়াতও দেয়নি। এত কাছে এসেও সে বেঈমান অবস্থায় দেশে ফিরে যাবে? মেনে নিতে কষ্ট হয়।

হাম্মাম হেজাজী লিখেন,

-আব্বার কথা শুনে আমার চিন্তায় এল, আমরা আসলে অমুসলিমদেরকে কতোটা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখি? তারা যে ঈমানহারা, সেটা নিয়ে আমরা কতোটা ভাবি? তাকে ঈমানের দৌলত দেয়ার জন্যে আমরা কতোটা চিন্তা করি?

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৪

ইলযা কোঙ্গায়েভা

চেচনিয়ার এক পাহাড়ঘেরা গ্রাম। কয়েকদিন আগে রুশ ভল্লুকরা এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। জেনারেল বোগদানভ এই দলের দায়িত্বশীল অফিসার। তারা গ্রামে ঢুকেই তল্লাশী শুরু করলো। মুজাহিদ কোথায়! মুজাহিদ!

একটা ঘরে ছিল একটি আঠার বছররে যুবতী। ঘোমটা দিয়ে ঘরের এককোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোগদানভের কুৎসিত দৃষ্টি পড়লো তার ওপর।

সাথে থাকা সেপাইকে বললো:

-এ মেয়েকে ধরে বাইরে আনো।

মেয়েটির বাবা-মা-বড় ভাই হাউমাউ করে উঠলো। কিন্তু সৈন্যদের বেয়নেটের খোঁচায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। মা পাগলিনীর মতো ছুটে গিয়ে জেনারেলের পা চেপে ধরলো। লাথি মেরে সরিয়ে দিল।

মেয়েটাকে সাথে একটা পাশের এক ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ভেতর থেকে চাপা গোঙানী আর আর্তনাদের ভেসে আসছিল। পুরো গ্রামের আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর পশুটা বের হয়ে এল। সাথে নিয়ে এল বিধ্বস্ত একটা অর্ধমৃত লাশ। একজন সেপাইকে দিয়ে রশি আনাল। গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেয়েটাকে মেরেই ফেলল। মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। বাবার দু'চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল। ভাইয়ের চোয়াল দু'টো পাষাণের মতো হয়ে গেল।

জানোয়ারটা এটুকুতেই থামলো না। লাশটাকে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে, তার ওপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে দিতে আদেশ করলো। গ্রামবাসীকে এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হলো।

সংবাদ পৌঁছে গেল চেচেনের সিংহ খাত্তাব, শামিল বাসায়েভ ও আবুল ওয়ালিদের কাছে। তারা এর প্রতিশোধ নেয়ার শপথ গ্রহণ করলেন। তারা রুশ বাহিনীর কাছে চব্বিশ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিলেন,

-সেই জেনারেলকে আমাদের হাতে সোপর্দ করো, নইলে আমাদের হাতে বন্দী থাকা নয় রুশসৈন্যকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

সময় পার হয়ে গেলেও, রুশ পক্ষ থেকে কোনও সাড়া মিলল না। ভাইয়ের হাতে তলোয়ার দিয়ে বলা হলো,

-বোনের প্রতিশোধ নাও।

লাশগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো ক্যাম্পে।

আবার সেই জেনারেলকে সোপর্দ করতে বলা হলো। সময় দেয়া হলো বাহাত্তর ঘণ্টা। কোনও সাড়া মিলল না।

রুশ রসদবাহী একটা ট্রাক সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বিস্ফোরিত হলো। ইস্তিশহাদী এই মেহনতে পুরো সেনানিবাস উড়ে গেল। পনেরশও বেশি হতাহত হলো। কিছু হলো বোমার আঘাতে। কিছু পরবর্তী ব্রাশ-ফায়ারে। ঘটনাটি ছিল ২০০০ সালের।

.

বোগদানভ অবশ্য সেই হামলায় মরেনি। তাকে মারা হয়েছিল মস্কোতে। তিনজন অজ্ঞাত বন্দুকধারী একটা মিৎসুবিশি ল্যান্সার চালিয়ে এসেছিল।

পরপর চারটা গুলি করা হয় তার মাথায়। প্রকাশ্য দিবালোকে। সে তখন তার অফিস থেকে বের হচ্ছিল। ঘটনাস্থলেই সে অক্কা পায়।

বোগদানভ এতবেশি নিষ্ঠুর ছিল, খোদ রাশান কর্তৃপক্ষই তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু চরমপন্থী রাশানদের কাছে সে ছিল বীর!

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৫

ভালোবাসার অর্থ

ভালোবাসা মানে:

= ভালোবাসা মানে আলী (রা.)। যখন তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন, কুরাইশ চারপাশে জড়ো হয়েছে নবীজিকে হত্যা করার জন্যে। মুহাম্মাদকে না পেয়ে, রাগে-ক্ষোভে-আক্রোশে কাফিররা তাকেই হত্যা করে ফেলতে পারে।

ভালোবাসা মানে:

= বেলাল (রা.)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আযান দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের পর, উমর (রা.) তাকে অনুরোধ করলেন, প্রথম আযানটা তাকেই দিতে। তিনি দাঁড়ালেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এখন তো নবীজি তার উত্তর দিবেন না। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা.)-ও বেসামাল হয়ে পড়লেন।

বেলাল (রা.)-ই একমাত্র মুয়াযযিন, যিনি তিনটা বিশেষ মসজিদেই আযান দেয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

ভালোবাসা মানে:

= আক্ষরিক অর্থেই বিমূর্ত হয়ে ওঠে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায়, তিনি যখন বললেন:

-আয়েশার ব্যাপারে আমাকে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। (অর্থাৎ তার ব্যাপারে এমন কিছু বলো না যা আমাকে পীড়া দেয়।) অথচ শিয়ারা?

ভালোবাসা মানে:

= আবু বকর (রা.)। তিনি বলেন,

-আমরা ছিলাম হিজরতের পথে। পথে দু'জন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। আশপাশ খুঁজে দুধ নিয়ে এলাম। আমি আগে না খেয়ে নবীজিকে বললাম, আপনি আগে পান করুন।

ভালোবাসা মানে:

আবু বকর (রা.)। গারে সাওরে আশ্রয় নেয়ার আগে, তিনি বললেন:

-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আগে প্রবেশ করি। ভেতরে যদি ক্ষতিকর কিছু থাকে?

ভালোবাসা মানে:

= আবু বকর (রা.)। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল আবু বকর কাঁদতে শুরু করলেন। নবীজি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

-আবু বকর! কেঁদ না। যদি কোনও মানুষকে আমি 'খলীল' হিশেবে গ্রহণ করতাম, তবে তোমাকেই গ্রহণ করতাম।

ভালোবাসা মানে:

= যুবায়ের (রা.)। যখন ভুলভাবে প্রচারিত হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি কোষমুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কার কুফফার শক্তিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করলেন না। অথচ তখনো তার বয়েস পনের। ইসলামের পক্ষে তার তরবারিই সর্বপ্রথম কোষমুক্ত হয়েছে।

ভালোবাসা মানে:

= রবী'আ বিন কা'ব (রা.)। দুরবস্থা দেখে নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন,

-তোমার চাওয়া কী?

-আমার একটাই চাওয়া, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হওয়া।

ভালোবাসা মানে:

= দীনার গোত্রের এক নারী। ওহুদ যুদ্ধে তার স্বামী-সন্তান-ভাই শহীদ হয়েছেন। সবাই এসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু তার চিন্তা নবীজিকে নিয়ে। তাঁকে সুস্থ দেখে বললেন,

-আপনার নিরাপদ-জীবিত থাকার আনন্দের কাছে আর সব শোক তুচ্ছ!

ভালোবাসা মানেঃ

= সাওবান (রা.)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন,

-তোমার চেহারা ফ্যাকাশে আর বিবর্ণ হয়ে গেছে কেন?

-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কোনও রোগ নেই। শরীরে কোনও ব্যথাও নেই। কিন্তু আমি আপনাকে না দেখলে আমার ভেতরে কেমন যেন লাগতে শুরু করে। অস্থিরতা শুরু হয়। আপনাকে দেখার পর আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

নবীজিকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে, সেটার একটা ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটার ভাবার্থ:

-আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা রাখে, এমন কিছু লোক আমার পরে আসবে। তাদের ভালোবাসা এতই প্রবল হবে, তারা কামনা করবে, তাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও যদি একটিবারের জন্যে আমাকে দেখতে পেতো! (মুসলিম)।

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৬

রঙবেরঙের চালক

জামাই চালক!

খাগড়াছড়ি থেকে ফেনি আসছি। গাড়ি রামগড় পার হয়েছে। বাগান বাজারের একটু আগে বাস দাঁড়িয়ে গেল। হেল্পারকে দেখলাম একটা ইয়াব্বড় বাজারের থলে নিয়ে দৌড়ে পাশের বাড়িতে চলে গেলা। থলের মুখ দিয়ে বিরাট এক রাতা মোরগের মাথা বেরিয়ে আছে।

একটু পর চালক মশায়ও চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বের হলেন। মুখটা হাসি হাসি। হেল্পার একটা পিঠা খেতে খেতে ফিরে এল। জানা গেল এটা চালকের শ্বশুর বাড়ি। একটু দেখা করেই চলে আসবে।

আমরা বসে আছি। বসে আছি। চালকের দেখা নেই। সব যাত্রী বিরক্ত মনে অপেক্ষা করতে লাগলো। কেউবা নেমে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল। কেউ উশখুশ করতে লাগল। মনে হলো, একযুগ পর চালক ফিরলেন। বেশ খোশ মেজাজে। মুখে পান। লাজুক মুখে যাত্রীদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমাও চাইলেন দেরির জন্যে।

একটা খিলাল ঠোঁটের এক কোণে গোঁজা। আমি বসেছি ঠিক চালকের পেছনে। আসনে বসতেই লাক্স সাবানের সুবাস ভেসে এল। ভ্রু কুঁচকে খেয়াল করতেই দেখি চালকের চুল ভেজা। শার্টের কলার ভিজে আছে। হেল্পারের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও চালকের চুলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অ্যাথলেট চালক!

গিয়েছিলাম পাসপোর্ট অফিসে। আগারগাঁও। কাজ শেষে ফিরে আসছি। শিশুমেলার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা পার হবো। একটা বাস পেছন থেকে আরেকটা বাসকে ধাক্কা দিল। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

হঠাৎ করে, বাসের চালক, তার পাশের কাঁচের জানালা ভেঙে এমন ভোঁ দৌড় দিল, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিমিষেই হাওয়া! অনেক চালক দেখেছি, কিন্তু এমন ভর রাস্তায় এভাবে গাড়ি ফেলে, ভর্তি যাত্রী ফেলে, কার্ল লুইস-উসাইন বোল্টের সম্মিলিত গতিতে দৌড়তে সক্ষম অ্যাথলেট চালক আর দেখিনি।

কর্তব্যরত পুলিশ তাকে ধরবে কি, হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম।

নাসিক্য চালক!

খাগড়াছড়ি থেকে ফেনী আসছি। আলুটিলার বিপদজনক বাঁক। চড়াই-উৎড়াই। কিন্তু চালককে দেখলাম এমন চলন্ত গাড়িতেও অন্য এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। উনি আঙুল দিয়ে নাক পরিস্কার করছেন। একবার স্টিয়ারিং হুইলও ছেড়ে দিলেন। আরেকবার বাঁক নেয়ার আগে হর্ন দিলেন না। বিপরীত দিকের চালকও হর্ন দেননি। একটুর জন্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না। এমন বিপদের মুখে পড়েও চালকের কোনও বোধোদয় হলো না। তিনি আরও কিছুক্ষণ নাক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে গেলেন।

মাইকেল শুমাখার!

আমরা যাচ্ছি মারকাযুদ দাওয়াতে। প্রায় পঁচিশ জন। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের কাছে তিনদিন থাকবো। শ্যামলি থেকেই একটা দুইটা টেম্পু ভাড়া করা হয়েছে। চালকটা তরুণ যুবাপুরুষ। বেশ নাদুস নুদুস। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে।

আমি একটার সামনে বসেছি। সাথে আছে চালকের একজন বন্ধু। গাবতলি পার হয়েই গাড়ি যেন ডানা মেলে উড়াল দিল। আমি তো প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ব্রেক ফেল করলো কি না। ভুল ভাঙল, না চালকই তার সর্বোচ্চ গতিতে গাড়ি হাঁকাচ্ছে।

গাড়ি বাঁই বাঁই করে আমিন বাজার পার হলো। চোখের পলকে হেমায়েতপুর পৌঁছে গেল। এর মধ্যে কতো গাড়িকে ওভারটেক করলো, কতো পথচারীকে ছিটকে ফেললো, কতো ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করে ছুটে পালাল, কতো গরু রশি ছিঁড়ে হাম্বা রব তুলে পানিতে নামল, তার ইয়ত্তা নেই।

সাধারণত সব চালকই স্পীড ব্রেকার সামনে পড়লে, গাড়ি কমায়। এ পাগলা চালককে দেখলাম স্পীড ব্রেকার সামনে পড়লে আরও গতি আরও বাড়িয়ে দিতে। এমনিতে টেম্পুটা লক্করঝক্কর। সারাক্ষণ ক্যাঁ কোঁ, কড়কড়াৎ ঝনঝন আওয়াজ তুলছে। ভয়ে ভয়ে আছি কখন চাকাগুলো ঘুরে চারটা পাঁচদিকে ছিটকে যায়। গাড়ির নড়বড়ে বডিখানা উড়ে দূরে গিয়ে ছেতরে পড়ে! নাহ, তেমন কিছুই ঘটল না।

একটা গতি নিরোধক আসে, আর চালক গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। গাড়িও ধাক্কা খেয়ে উড়াল দেয়। মনে হতো কয়েক সেকেন্ড গাড়ি শূণ্যের ওপর ভেসে থাকে। তারপর ঝপাৎ করে মাটিতে ল্যান্ড করেই হ্যাঁচকা টানে আবার দৌড়! গাড়ি যখন লাফ দেয়, চালকও হুইল ধরে উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

হযরতপুর পৌঁছে, একজন আরেকজনকে ধরাধরি করে নামাল। সবাই রাস্তার পাশে বসে পড়লো। চালককে যতই বকতে যাই সে ততই ব্যাল ব্যাল করে হাসে!

-আরে হুযুর! মাইয়া মাইনচির লাহান এত ডরাইল্যা অইলে চলে? গাড়িত চড়বেন মরদের লাহান!

এরপর আর কথা বাড়ানো চলে না। কেইবা মাইয়া মাইনচির লাহান হতে চায়?

সুর রসিক চালক!

গাড়ি চলছে। আমরা যাচ্ছি কক্সবাজার। নতুন ব্রীজ পার হওয়ার পরই চালক জোরে হাঁক দিয়ে বললো:

-ও ডো! ইক্কা আয়!

-জ্বি ওস্তাদ!

-লাগা!

-আইচ্ছা।

হেল্পার একটা কাগজের বাক্স বের করলো। অসংখ্য ক্যাসেট। সেই আদি কালের। এভাবে একটানা চলতে থাকলো। একটা শেষ হওয়ার আগেই চালক হাঁক দিয়ে উঠে,

-ও ডো! আর তিন মিলিট পরে বদোলাই দিবি!

আমরা মিটিমিটি হাসছিলাম। চালক মশায়ের দেখি প্রতিটা ক্যাসেটের টাইমিং পর্যন্ত ইয়াদ আছে। কোন গান কতক্ষণে শেষ হবে, সেটাও আগাম বলে দিচ্ছে।

গায়ক চালক!

ঢাকা থেকে বাসে উঠেছি। যাত্রাবাড়ী পার হওয়ার পরই গান চালিয়ে দেয়া হলো। বরাবরের মতো চালকের পেছনেই আছি। সাধারণত সি-৪ আসনেই বসি। অথবা এ-১। দুই আসনের দুই তাৎপর্য।

সেই আদ্দিকালের রদ্দিমার্কা চলছে। চালককেও দেখলাম তাল ঠুকছে। তালে তালে সুর ভাঁজছে,

-আজ দুজনার দুটি পথ..............।

অবাক করা ব্যাপার হলো, সুরটাও নিখুঁতভাবে তুলে আনতে পারছে। যেখানে গলার যেমন কারুকাজ দরকার সেভাবেই করছে।

.

গাড়ির চালকদেরকে সব সময় মরা মরা গানই শুনতে দেখি। খুব কমই ব্যতিক্রম হতে দেখেছি। যে কয়বার ব্যতিক্রম হয়েছে প্রত্যেকবারই বিপদ হয়েছে।

একবার দাউদকান্দি আসার আগে, চালকের বোধ হয় ঘুম পাচ্ছিল। গান চালিয়ে দিল। ওরেব্বাস! ঝাকানাকা ব্যান্ড। চালকও বেশ চাঙ্গা হয়ে নাঙ্গা হাতে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। গানের বিকট (অ)সুর, ধুম-ধাড়াক্কা মিউজিক বোধ হয় চালকের রক্তকণিকায় তোড় এনেছিল। সাঁই সাঁই করে গতি বাড়ছে। এতক্ষণ যেসব গাড়ি আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে এসেছিল, আমরা এখন সেগুলোকে পেছনে ফেলে এগুচ্ছি।

ভালই লাগছিল। জোর গতি। কিন্তু ফ্যাঁকড়া বাধল একটু পর। চালককে তখন ব্যান্ডের নেশা পেয়ে বসেছে। এতবড় বাসের চালক হয়েও নিজেই বেসামাল হয়ে গাইতে শুরু করে দিল। তাও এটুকুতে থামলে কোনও সমস্যা ছিল না।

চালক বোধ হয় একটু বেশিই মজে গিয়েছিল। এতক্ষণ তো হাত দিয়ে টুসকি বাজাচ্ছিল। এবার পা-টাকেও তালে তালে ঠুকতে শুরু করে দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যা ভাবলাম তা ঘটতে দেরি হলো না।

হঠাৎ করে কী হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। চালক আচম্বিতে গায়কের সাথেই বিকট জোরে চেঁচিয়ে উঠলো:

-ফিরিয়ে দাও! আমারই .... তুমি ফিরিয়ে দাও.......

মুখে তো গাইলই, সাথে পা-টাকেও জোরে ঠুকলো। ব্যস, আর যায় কোথায়? ব্রেকের ওপর চাপ পড়লো। সাথে সাথে হার্ডব্রেক! কিরর করে বাস বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলো।

পুরো বাসের ঘুমন্ত যাত্রীরা প্রায় সবাই কপাল-হাত-পায়ে ব্যথা পেল। চালকের তখন অন্য মূর্তি। সে সমানে গালি দিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে তুফান বেগে খিস্তি-খেউড় লাভার মতো ছিটকে অদৃশ্য কোনও একজনের দিকে উদগীরিত হচ্ছে।

চালক গালির মাধ্যমে যাত্রীদেরকে বোঝাতে চাইল, বাসের সামনে দিয়ে এক বেকুব দৌড় দেয়াতেই হার্ড ব্রেক কষতে বাধ্য হয়েছে।

চালকের মনে নিশ্চয়ই কারও প্রতি ক্ষোভ ছিল। তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে বলতে গিয়েই, আমরা বাসসুদ্ধ প্রায় মারা পড়তে যাচ্ছিলাম। সেদিন বসে বসে ঠিক করেছিলাম:

ক: বাসে গরম গান চালানো নিষিদ্ধ করতে হবে। সবধরনের গান হলে আরো ভালো। ।

খ: চালক হিশেবে নিয়োগ দেয়ার আগে, ভালো করে খোঁজ-খবর করে নিতে হবে, সে ছ্যাঁকা খেয়ে একা হয়ে পড়া কোনও 'মজনু-ফরহাদ-রোমিও' কি না। না হলে, সে তার হারানো .... ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, আমাদের জানটাই আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে!

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া চালক!

পটিয়া থেকে শহরে আসছি। উঠেই কান ঝালাপালা। সেই আদি ও আসল সুর:

= মোহসেন আউলিয়া বাবা করলা মোরে দিওয়ানা!....

গায়কও সেই শিমুল শীল।

নেমে পড়বো কি না ভাবছি, কিন্তু পেছনের দিকে পরিচিত একজন ইশারায় ডাক দেয়ায় নামা হলো না। বুঝতে পারলাম, আজ মাথা ব্যথা চরম আকার ধারণ করবে।

বাস শান্তির হাট পৌঁছলো। বাজার ছেড়ে একটু সামনে আসার পরই, আচানক চালক চেঁচিয়ে উঠলো:

-ও ডো! শুক্কুইয়্যা! পানির বোতল্লো দে!

বোতলটা নিয়েই, সেকি দৌড়রে বাবা! তিন লাফে রাস্তার পাশে একটা ঝোঁপের আড়ালে চলে গেলো। বাসের যাত্রীরা প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। পরক্ষণেই বাসে যেন বোমা ফাটলো। হাসির আওয়াজে!

কাজ সেরে চালক এমন ভঙ্গিতে ফিরলো যেন কিছুই ঘটেনি। শিস দিচ্ছে আর বাবা মোহসেন আউলিয়া গাইছে!

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৭

প্রবঞ্চক-প্রবঞ্চিত!

লোকটার পেশাই হলো মানুষকে ধোঁকা দিয়ে উপার্জন করা। বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে আয়-রোজগার ভালোই হয়। দেখেশুনে একটা বিয়েও করেছে। ছিল একজন, হয়েছে দু'জন। ফন্দি-ফিকিরও বেড়ে গেলো।

দু'জনের ইচ্ছা: অনেক তো ছন্নছাড়া জীবন হলো, এবার একটু থিতু হয়ে বসা যাক। সুন্দর দেখে একটা শহর বাছাই করলো। মলিন বেশে, ছিন্ন ভূষায় শহরতলির এক ছোট্ট ঝুপড়িতে বসবাস শুরু করলো।

এবার আয়ের যোগাড়যন্ত্র দেখতে হয়। ফন্দিবাজ বাজারে গিয়ে একটা গাধা কিনে আনল। কয়েকদিন অভুক্ত রেখে দিল। এরপর খাবার না দিয়ে, গাধাটাকে স্বর্ণমুদ্রা খাওয়াল। মুখেও বেশ কিছু মুদ্রা ঠেসে ঢুকিয়ে দিল। লোকজন তো এমন স্বর্ণপ্রসবা গাধা দেখে বিমোহিত। সাথে সাথে খবর গেলো শহরের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীর কাছে। ছুটে এলেন তিনি। আকাশচুম্বী

দামে গাধাটা কিনে নিল। পেট থেকেই যেখানে স্বর্ণ বের হচ্ছে, দাম নিয়ে দ্বিধায় ভোগা ঠিক নয়।

কিছুক্ষণ যেতেই ব্যবসায়ী বুঝতে পারলো সে ধোঁকা খেয়েছে। এতদিনের জমানো টাকা দিয়ে একটা ভুয়া গাধা কিনেছে। দলবল নিয়ে প্রবঞ্চকের বাড়িতে চড়াও হলো। ঘরে শুধু বউকে পেলো:

-তোর স্বামী কোথায়?

-এই তো একটু বাইরে গিয়েছে। আসতে দেরী হবে!

-তা হবে না, তাড়াতাড়ি তাকে আনার ব্যবস্থা কর!

স্ত্রী তাদের পোষা কুকুরটাকে পাঠিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর প্রবঞ্চক পাঠানো কুকুরটার মতো হুবহু আরেকটা কুকুর নিয়ে এলো। ব্যবসায়ী কুকুরের কৃতিত্ব দেখে রীতিমতো মুগ্ধ! আমার তো এমন একটা কুকুরই প্রয়োজন! এটা আমার চাইই!

-কুকুরটা বিক্রি করবে?

-না না, এটা আমার খুবই প্রিয় আর কাজের কুকুর! এটা ছাড়া আমি অচল!

-না, তুমি যতো টাকা চাও, দিতে রাজি!

-ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন, কী আর করা!

বাড়ি গিয়ে দেখা গেলো কুকুরটা আস্ত এক ধোঁকা! কিছুই করতে পারে না। বসে বসে শুধু ঝিমোয় আর একগাদা খাবার সাঁটায়। ব্যবসায়ী দাঁত কিড়মিড় করে ধেয়ে এলো,

-তোর জামাই কই?

-বাইরে গেছেন। আসতে দেরী হবে!

-আমার তার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি!

প্রবঞ্চক এসে দেখলো ব্যবসায়ী দলবল সহ বসে আছে। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীর ওপর চড়াও হলো,

-মেহমানকে বসিয়ে রেখেছিস যে বড়! নাস্তাপানি কিছু দিয়েছিস?

-তোমার মেহমানকে আমি কেন নাস্তা দিতে যাবো?

-কী বললি হতচ্ছাড়ি! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!

প্রবঞ্চক একটা ছুরি নিয়ে স্ত্রীর ওপর হামলে পড়লো। মুহুর্মূহু আঘাত করে মেরেই ফেললো। সবাই দেখলো রক্তে রক্তে মাটির মেঝেয় ভেসে যাচ্ছে।

খেয়াল করলে বুঝতে পারতো, ওটা ছিল রঙ, রক্ত ছিল না।

সবাই হতভম্ব! আমাদেরকে মেহমানদারী করেনি বলে বউকে মেরেই ফেললো। আমাদের জন্যে তার এত টান! তাদের হতবিহ্বল অবস্থায় রেখে, প্রবঞ্চক ঝোলা থেকে একটা বাঁশি বের করলো। করুণ সুর বেজে উঠলো। কিছুক্ষণ বাজানোর পর, মরা বউ আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। সবার ছানাবড়া দৃষ্টির সামনে গিয়ে মেহমানদের জন্যে নাস্তা বানাতে বসলো।

-ভাই! এ বাঁশি না হলে আমার জীবনটাই বৃথা যাবে। তুমি না করো না!

-অসম্ভব! আমি এ-বাঁশি হাতছাড়া করতে পারবো না!

-তুমি যা চাও, পাবে!

-আচ্ছা, আপনি বন্ধু মানুষ! মুখের ওপর না বলি কী করে!

রাতে ব্যবসায়ী কথা কাটাকাটি করতে করতে রেগে কাঁই হয়ে, বউকে এক কোপে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেললো। নিশ্চিন্ত মনে বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে গলা ফুলিয়ে ফেললো। বউ আর জাগে না।

সকাল বেলায় অন্যরা জানতে চাইলো:

-কী, বাঁশি কেমন কাজ দিল?

ব্যবসায়ী ভয়ে স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বীকার করলো না:

-খুবই ভালো কাজ দিয়েছে। ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে দিব্যি মরা মানুষটা উঠে আঁউউঁ করে হাই তুললো।

-ভাই আমাকে বাঁশিটা এক রাতের জন্যে ধার দাও না!

এভাবে একজনের কাছ থেকে আরেকজন ধার নিল। কেউ কারো কাছে ধরা খাওয়ার কথা স্বীকার করলো না। এক সময় বিষয়টা ফাঁস হলো। ফুঁসে উঠলো বউহারা মানুষের দল। একাট্টা হয়ে প্রবঞ্চকের বাড়িতে হানা দিল। ব্যাটাকে বস্তাবন্দী করে সাগরে ফেলার জন্যে রওয়ানা দিল।

সাগর- গ্রাম থেকে বহুদূরে। অর্ধেক পথ যেতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বস্তাটা এক পাশে রেখে, প্রতিবাদী লোকেরা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো। আগামীকাল ফেলা যাবে। প্রবঞ্চক ক্ষুৎ-পিপাসায় কোঁ কোঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। পাশ দিয়ে এক রাখাল যাচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল:

-কী ভাই! তোমার এ-অবস্থা কেন?

-আর বলো না, আমাকে শহরের বড় ব্যবসায়ী প্রস্তাব দিয়েছিল তার মেয়েকে বিয়ে করতে। আমি রাজি না হওয়াতে এই অবস্থা!

-রাজি হলেই পারতে!

-তাহলে আমার চাচাত বোনের কী হবে? তাকে ছাড়া আমি একদণ্ডও বাঁচবো না!

-এক কাজ করলে কেমন হয়, আমি তোমাকে ছেড়ে দিই, কাল সকালে সবাই জাগলে, আমি বলবো, বিয়েতে রাজি!

-দারুণ বুদ্ধি তোমার! এটাই করো! জলদি! ওরা কেউ জেগে যাবে!

দু'দিন পর ব্যবসায়ী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা দেখলো, সাগরে ফেলা লোকটা তিনশ ভেড়ার বিশাল এক পাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে শহরে ঢুকছে। পুরো শহর ভেঙে পড়লোঃ

-তোমাকে না আবোল-তাবোল বকা অবস্থায় সাগরে ফেলা হয়েছিল?

-হ্যাঁ!

-তাহলে উঠে এলে কী করে!

-সাগর তলে যাওয়ার আগেই কিছু একটা এসে আমাকে কোমলভাবে ধরে ফেললো। সাথে সাথে বস্তার মুখ খুলে ফেললো। এক রূপসী মৎস্যকন্যা! আমার করুণ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলল। আদর করে তীরে নিয়ে এলো। অনেক মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরত আর তিনশটা ভেড়া দিয়ে বিদেয় দিল। আশ্বাস দিল, এরপর আবার আরও গভীর সমুদ্রে ফেললে, সেখানে তার আরও ধনী বোনেরা আছে। তারা অনেক বেশি উপহারসহ মুক্ত করবে আমাকে!

শহরবাসী হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কে কার আগে বস্তাবন্দী হবে! একে একে সব পুরুষ বস্তাবন্দী হলো। মহিলারা তো আগেই মারা পড়েছে। এবার গেলো জামাইরা। বাকী রইল বাচ্চা-কাচ্চারা। তাদের নিয়ে মনের মতো একটা রাষ্ট্র-গঠন করলো।

বলাবাহুল্যঃ

= প্রবঞ্চকটা ছিলো ইহুদি (ইসরাইল রাষ্ট্র)।

= বউটা ছিলো আমেরিকা।

= শহরবাসী ছিল আরব ও মুসলিম বিশ্ব!

—৩

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৮

কবির বোন

মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন। একজন ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.)। একজন কবি। কবির কথা মনে হলে, আমার বা কারো কারো চিন্তায় ভেসে ওঠে ভবঘুরে, ভীরু মানুষের কথা। অথচ বাস্তবে তেমন নয়। তিনি একজন কবি। তাকে কেন নবীজি সেনাপতি বানালেন? এমন কী গুণ ছিল তার মধ্যে?

আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা শখ ও স্বপ্ন হলো:

= বিভিন্ন সময়ে নেয়া, নবীজির নিয়োগমূলক সিদ্ধান্তগুলো দেখে দেখে, সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর গুণাবলী বের করে আনা। পেয়ারা নবী কী দেখে তাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন?

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-ও এমনি একজন। তাকে নিয়ে পড়তে গিয়ে চলে গেলাম আরেক দিকে। এক মহিলা সাহাবীর কাছে। উমরা বিনতে রাওয়াহা (রা.)। কবির বোন।

এই মহিয়সীর চিন্তার গভীরতা আর দ্বীনি বুঝ দেখে আমি অবাক! বিয়ে হয়েছে বশীর বিন সা'দ (রা.)-এর সাথে। এটা অবশ্য বশীরের প্রথম বিয়ে নয়। আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করলেন। নু'মান। বিখ্যাত সাহাবী নুমান বিন বশীর (রা.)।

ছেলে বড় হলো। হাঁটতে-দৌড়াতে শিখল। মায়ের ইচ্ছা হলো, ছেলেকে কিছু একটা উপহার দেয়ার। দামি কিছু। স্থাবর বা অস্থাবর জাতীয়। বাবা বশীরের মনে দ্বিধা। আগের ঘরের সন্তানদের ফেলে, শুধু একজনকে উপহার দিতে মন সরছিল না। তবুও শেষে দোদুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে স্ত্রীর মতে সায় দিলেন। তাও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে সময় নিলেন পাক্কা একটা বছর।

ছেলেকে একখণ্ড জমি দান করলেন। এবার স্ত্রীই কিছুটা দমে থাকলেন যেন। সরাসরি দানটা গ্রহণ করতে চাইলেন না। তার চিন্তা জাগলো:

=এভাবে নেয়াটা শরীয়ত সমর্থন করবে কি না! আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্মতির বাইরে গিয়ে কিছু গ্রহণ করলে তো বরকত আসবে না। উপহারটার প্রতি নিজের চাহিদা থাকলেও শরীয়তের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়াই মুমিনের কর্তব্য।

স্বামীকে বলেও ফেললেন নিজের দ্বিধার কথা,

-নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ছাড়া ছেলের উপহারটা গ্রহণ করবো না!

বাপ-বেটা দরবারে নবুওয়তে এলেন। পুরো বিষয়টা খুলে বললেন,

-স্ত্রী আমার কাছে কিছু চেয়েছে, এ-ছেলের জন্যে!

-ও ছাড়া তোমার আর কোনও সন্তান আছে? সত্যি করে বলবে! তুমি তাদের সবাইকে কিছু কিছু দিয়েছ?

-জি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আরও সন্তান আছে। তাদেরকে কিছু দেয়া হয়নি।

-তুমি কি চাও না, তোমার পিতৃস্নেহ সব সন্তানের ওপর সমান হোক?

-জি চাই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

-তাহলে আল্লাহকে ভয় করো। সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করো!

***

(এক) একজন মহিলা সাহাবীর মনে সন্তানের প্রতি দরদ এল। কিন্তু শরীয়তকেই প্রাধান্য দিলেন। স্বামীকে সরাসরি বিষয়টা মুফতিয়ে আযম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করতে বললেন।

(দুই) নিজের চিন্তায় এলেও পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছেন, চিন্তাটা সঠিক পথে যাচ্ছে কি না আল্লাহর আদালতে পেশ করে বিষয়টা যাচাই করে নেয়া জরুরী। তাই করলেন।

(তিন) স্বামী এক বছর পর্যন্ত ভেবেছেন। কিন্তু নবীজির কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়ার বিষয়টা হয়তো মাথায় আসেনি। কিন্তু স্ত্রীর চিন্তা ঠিকই আসল জায়গায় পৌঁছেছিল।

(চার) নবীজির সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সানন্দে মেনে নিয়েছেন।

.

= বোন এমন হলে, ভাই কেমন হবেন? নবীজির নির্বাচনের ওজন বোঝার জন্যে বেশি দূরে যেতে কেন?

জীবন জাগার গল্প : ৪৯৯

ওমরের কান্না

কিলাব বিন উমাইয়া। একজন সর্দারপুত্র। বাবা-মায়ের খুবই প্রিয়। ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে মদীনায় এলেন। কয়েকদিন ঘুরে-বেড়িয়ে কাটালেন। বড় বড় সাহাবীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করলেন। একদিন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও যুবাইর বিন আউয়াম (রা.)-কে সামনে পেয়ে প্রশ্ন করলেন:

-ইসলামে কোন আমল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?

-আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ!

কিলাব সরাসরি খলীফার দরবারে হাজির হলেন:

-আমীরুল মুমিনীন! আমি জিহাদে যেতে চাই!

-বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো!

বৃদ্ধ বাবা-মা বাধ সাধলো,

-আমাদেরকে বুড়ো বয়েসে রেখে চলে যাচ্ছো!

কিলাব অনেক বলে কয়ে বাবা-মাকে রাজী করালেন। ওমর (রা.) বললেন,

-যাও পারস্যের দলটার সাথে!

জিহাদে চলে গেলেন। এদিকে বৃদ্ধ বাবা মা ছেলের অবর্তমানে অসহায় হয়ে পড়লেন। প্রতিদিন ছেলের পথ চেয়ে অপেক্ষা করেন। পথের ধারে এক খেজুর গাছের তলে। একদিন দেখলেন একটা কবুতর ছানাকে আধার খাওয়াচ্ছে। এটা দেখে বাবার পুত্রস্নেহ আরও বেড়ে গেলো।

বাবার বয়েস হয়েছে। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। দীর্ঘ দিন কেটে যাওয়ার পরও ছেলে আসছে না দেখে খলীফার দরবারে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

-আমীরুল মুমিনীন! আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। একটি বারের জন্যে হলেও তাকে দেখতে চাই!

খলীফা সাথে সাথে খবর পাঠালেন পারস্য সীমান্তে। কিলাব এলেন মদীনায়। ওমর (রা.) জানতে চাইলেন:

-তুমি কিভাবে বাবার খিদমত করেছ যে তিনি তোমাকে এভাবে ভালোবাসেন?

-আব্বু যা ভালোবাসেন, তার চাওয়ার আগেই আমি সেটা করেছি। তিনি যা অপছন্দ করেন নিষেধ করার আগেই আমি তা পরিহার করেছি।

-আর কিছু?

-অন্যরা যেভাবে দুধ দোহন করে, আমি সেভাবে করতাম না। এ-ব্যাপারে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে।

-কেমন?

-রাতে ঘরে এলে, দুধেল উটনীর ওলানগুলো গরম হয়ে থাকতো। আমি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওলান ভালো করে ধুয়ে নিতাম। যাতে ভেতরের দুধগুলো ঠান্ডা হয়। তারপর আব্বুর জন্যে দুধ দুইতাম। এটাও হতো বিশেষ পদ্ধতিতে। যেন ভালো জাতের পনির তৈরী করা যায়। ফজরের পর সে দুধ আমি আব্বুকে খেতে দিতাম।

-শুধু দুধের চুমুকের জন্যেই তোমার প্রতি বাবার এত গভীর ভালোবাসা?

-এছাড়াও আরও নানাভাবে আমি বাবার সেবা করেছি।

-আচ্ছা, এখন আমার জন্যেও সে বিশেষ পদ্ধতিতে দুধ দোয়াও তো দেখি!

-আমীরুল মুমিনীন! আগে কি একবার আব্বুর সাথে দেখা করে আসবো?

-না, তুমি দুধ দুইয়ে যাও সেই বিশেষ পদ্ধতিতে!

তারপর ওমর (রা.) কিলাবকে আড়ালে চলে যেতে বললেন। তারপর বৃদ্ধ উমাইয়াকে ডেকে পাঠালেন,

-হে আবু কিলাব! দুনিয়াতে তোমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা কী?

-আমীরুল মুমিনীন! এই বয়েসে আর কোনও আকাঙ্খা নেই।

-কোনও আকাঙ্খাই নেই?

-একটা আছে, আমার ছেলেটাকে একটিবারের জন্যে হলেও দেখা!

-আচ্ছা ঠিক আছে, এবার একটু দুধ পান করো।

বৃদ্ধ অর্ধান্ধ উমাইয়া দুধের পেয়ালা হাতে নিয়েই কেঁদে দিলেন। বললেন:

-আমি যে দুধে আমার কিলাবের ঘ্রাণ পাচ্ছি! এ কী করে সম্ভব! বাবা কিলাব! তুই কই!

ওমরের ইশারায় কিলাব সামনে এলেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। পিতাপুত্র আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে শুরু করলেন। ওমর (রা.)-ও কেঁদে দিলেন। এতবেশি চোখের পানি বের হলো, মোছার জন্যে পাগড়ির খুঁট ব্যবহার করতে হলো!

জীবন জাগার গল্প : ৫০০

পিঁপড়া প্রজা!

সুলাইমান আল কানুনী (রহ.)। ১৫২০-১৫৬৬। অন্যতম সেরা উসমানি খলীফা। তার বিরুদ্ধেই প্রাচ্যবিদরা বেশি অপপ্রচার চালিয়েছে। তার কারণেই ইউরোপ বারবার মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছে। তিনি শহীদ না হলে, ইউরোপের ইতিহাসই আজ ভিন্ন হতো। তাঁকে এমনসব জঘন্য অপবাদ দেয়া হয়েছে যা মানুষ শত্রুকেও দেয় না। কয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে একটা ধারাবাহিক তৈরী করা হয়েছে, কাতারভিত্তিক টিভি এমবিসি। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক নষ্টের গোড়া এই টিভি কোম্পানি। সুলতানকে দেখানো হয়েছে নারীলোভী এক শাসক হিশেবে! আরও নানা অপবাদ!

.

তোপকাপি প্রাসাদের রক্ষকরা সুলতানের কাছে অভিযোগ করলো:

-প্রাসাদের গাছগুলোকে পোকায় ধরেছে। ওষুধ দিয়ে মারার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

সুলতান বললেন, আগে শায়খুল ইসলামের ফতোয়াটা জেনে নিই! তারপর সিদ্ধান্ত! স্বয়ং গেলেন প্রধান মুফতির কাছে। পেলেন না। একটা চিরকুটে আরবি কবিতা আকারে লিখে রেখে এলেন:

-গাছে পিঁপড়া ধরলে মারাটা কি বৈধ হবে?

শায়খুল ইসলাম আবুস সাউদ আফেন্দী! বিখ্যাত তাফসীরের রচয়িতা। ফিরে এসে সুলতানের চিরকুট পেলেন। তিনিও উত্তরটা লিখলেন কবিতায়:

-মীযান কায়েম হলে, পিঁপড়া তার হক বুঝে নেবে।

সুলতান বুঝে গেলেন, এভাবে ঢালাওভাবে পিঁপড়া মারা ঠিক হবে না।

.

এমনি ছিলেন তিনি। ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া ছাড়া এক পাও নড়তেন না। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা যাওয়ার পথে যিকতুর প্রান্তরে জিহাদরত অবস্থায় শহীদ হলেন। অসিয়ত করে গেলেন: কবরে যেন লাশের সাথে নির্দিষ্ট ছোট্ট একটা সিন্দুক দেয়া হয়।

সবাই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলো, কী আছে সেই সিন্দুকে! বহুমূল্য হীরে জহরত! গোপন কোনও গুপ্ত ধনভাণ্ডারের নকশা?

সবার উপুর্যপরি কৌতূহলের কারণে সিন্দুকটা খোলা হলো। ভেতরে দেখা গেলো এক তাড়া কাগজ। সারাজীবন যেসব ফরমান জারি করেছেন, সেসবের স্বপক্ষে শায়খুল ইসলামের ফতোয়া! শায়খ আবুস সউদ কেঁদে উঠে বললেন:

-সুলাইমান! আপনি তো সব দায়ভার আমার কাঁধে চাপিয়ে, নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন। আমি যদি ফতোয়া দানে ভুল করে থাকি, আমাকে কে বাঁচাবে? আমি কার কাঁধে চাপাব?

সেকালে সুলতানগণ এমনই ছিলেন। তাই ওলামায়ে কেরামও এমন ছিলেন। এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন,

- সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট মারা যাওয়ার দিনকে খ্রিস্টানরা তাদের ঈদের দিনের মতো মনে করে। তাদের ধারণা মতে, সুলাইমান কানূনী ছিলেন সালাহুদ্দীনের চেয়েও বহুগুণ বেশি বিপদজনক!

জীবন জাগার গল্প : ৫০১

নটের তওবা!

আলি তানতাবী রহ. একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা আলেপ্পো শহরের। এই শহরেই এখন রাশান-আমেরিকা-বাশশার-ইসলামী জোট ও মুজাহিদীনের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। হলব সবসময়ই হকপন্থীদের সূতিকাগার।

-আমি হলবের এক মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। সামনেই এক যুবক নামায পড়ছে। আমি অবাক! আরে এ লোক তো অত্র এলাকার ত্রাস ছিলো। মদপান করতো। ব্যভিচার করতো। সুদঘুষের লেনদেন করতো। বাবা-মাকে কষ্ট দিতো। এমন কোনও পাপ নেই, যা সে করতো না। এই লোক মসজিদে কিভাবে এলো? বেজায় কৌতূহল নিয়ে তার কাছে গেলাম। জানতে চাইলাম:

-তুমি অমুক না?

-জি।

-আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমাকে দ্বীনের পথে এনেছেন। এটা কিভাবে হলো একটু বলবে?

- এক বুযুর্গের ওয়াজ শুনে।

-কোন বুযুর্গ? কোথায় ওয়াজ শুনেছ?

-আমাদের মহল্লার ইমাম। ওয়াজ শুনেছি 'রঙ্গালয়ে'।

-রঙ্গালয়ে?

-জি ঠিকই শুনেছেন। একদিন নাচের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। হুযুর জানতে চাইলেন

-মানুষজন কোথায়?

-সবাই নাট্যানুষ্ঠান উপভোগ করতে গিয়েছে। ভাড়া করা নগ্ন-অর্ধনগ্ন নটীরা নাচবে।

-রঙ্গালয় এখান থেকে কতদূর?

-বেশি দূরে নয়।

-একজন আমাকে নিয়ে চলো!

-সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। সবাই আপনাকে বিদ্রূপ করবে। ভেতরে প্রবেশ করতে দিবে না।

-সেটা পরে দেখা যাবে। আমি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও ভাল হয়ে গেছি! তিনি গালি সহ্য করতে পারলে আমি কোন ছার!

শায়খ সরাসরি ক্যাবারে গিয়ে হাজির হলেন। ম্যানেজার পথ রোধ করে দাঁড়ালো:

-আপনি এখানে কী করতে?

-আমি ভেতরের মানুষগুলোকে দ্বীনের কথা শোনাতে চাই!

-না সেটা সম্ভব নয়। তারা সবাই টিকেট কেটে প্রবেশ করেছে নাচ দেখতে। ওয়াজ শুনতে নয়।

-দাও, আমাকেও একটা টিকেট দাও!

-আপনি আমার ব্যবসা নষ্ট করতে এসেছেন।

-আচ্ছা, তুমি একদিনে কতো টাকা ব্যবসা করো? সে পরিমাণ টাকা আমি তোমাকে দিলে ভেতরে প্রবেশ করতে দিবে?

-জি দেবো!

শায়খের কার্যকলাপ দেখে ম্যানেজারের চোখ কপালে উঠে গেলো। তারপরও নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চুপচাপ দেখে যেতে লাগলো। দেখা যাক কী হয়! শায়খ জানতে চাইলেন প্রতিদিন নাচ শুরু হয় কখন?

-সকাল থেকে।

শায়খ পরদিন ভোরে ভোরে গিয়ে হাজির। প্রথমেই একজন নর্তকী নাচ পরিবেশন করলো। যবনিকা পতন হলো। বাতি নিভে গেলো। এবার আরেক জনের নাচ শুরু হবে। সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। কখন পর্দা উঠবে, নতুন নর্তকী দেখবে। সময় হলে আস্তে আস্তে পর্দা উঠে গেলো। বাতি জ্বলে উঠলো। সবার চক্ষু ছানাবড়া! এ কি দেখছে সবাই! কোথায় নৃত্য পটিয়সী নর্তকী! এ যে আমাদের বুড়ো ইমাম সাহেব! বিস্ময়ে কেউ কথা বলতে পারছিল না। পিনপতন নিরবতা! এই সুযোগে শায়খ কথা বলতে শুরু করলেন।

সম্বিত ফিরে পেতেই একদল যুবক উঠে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। আমরা নাচ চাই, ওয়াজ চাই না! তাদের সাথে আরও মানুষ যোগ দিল। বাড়া ভাতে ছাই ঢালা কেইবা সহ্য করতে পারে! শায়খ যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, তিনি তার মতো করে ওয়াজ চালিয়ে গেলেন। তারা আওয়াজ যত জোরে করে, শায়খ গলা চড়িয়ে দেন। একসময় যুবকের দল রণে ভঙ্গ দিল। একজন দাঁড়িয়ে বললো:

-তোমরা সবাই চুপ করো তো! উভয় পক্ষ একসাথে আওয়াজ করলে আমরা কার কথা শুনবো! তার চেয়ে বরং তোমরা চুপ করো! আগে শায়খের কথা শোনা যাক! পরে যা হয় একটা কিছু হবে!

শায়খ নতুন করে কথা শুরু করলেন। কুরআন তিলাওয়াত করলেন। হাদীস শরীফ পড়লেন। গুনাহর ক্ষতিকর দিক নিয়ে কথা বললেন। তাওবার কথা বললেন। আল্লাহর দয়ার কথা বললেন। জাহান্নামের কথা শোনালেন। জান্নাতের নায-নেয়ামতের কথা বিশদ করলেন। বুযুর্গদের কারগুযারি শোনালেন।

শায়খের কথার প্রভাব ছিল দেখার মতো। শ্রোতাদের মনে কথাগুলো গভীর রেখাপাত করলো। শ্রোতারা তো বটেই ক্যাবারে আসা নর্তকীরাও কৃতকর্মের জন্যে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। সবাই শায়খের হাতে তাওবা করলো। আয়োজকরাও তাওবা করলো। পুরো মহল্লা আল্লাহমুখী হয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ৫০২

নসীহত

হিশাম বিন আবদুল মালিক। উমাইয়া খলীফা। মক্কায় হজ করতে এসেছেন। সাথীদেরকে বললেন:

-খোঁজ নিয়ে দেখো, কোনও সাহাবী বেঁচে আছেন কি না!

-জি না, সবাই মারা গেছেন।

-কোনও তাবেয়ী?

বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস ইয়ামানী (রহ.)-কে হাজির করা হলো। তিনি জুতো খুলে রাখলেন খলীফার জুতোর সাথে। আমীরুল মুমিনীন সম্বোধন ছাড়াই শুধু সালাম দিলেন। তাও নাম ধরে বললেন:

-আসসালামু আলাইকুম হে হিশাম! কেমন আছো হিশাম?

খলীফার কোনও কুনিয়ত (উপনাম) যোগ করা ছাড়াই সম্বোধন করাতে, হিশাম অত্যন্ত রেগে গেলেন। তাবেয়ীকে হত্যার আদেশ দিতে পর্যন্ত উদ্যত হলেন। আশেপাশের সবাই তাকে নিরস্ত করলো।

-আমীরুল মুমিনীন! এটা হেরেম! পবিত্র স্থান। এখানে সব ধরনের হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ।

খলীফা কিছুটা সম্বিতে ফিরলেন। তাবেয়ীর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে বললেন:

-তাউস! এহেন বেয়াদবীমূলক আচরণ তুমি কিভাবে করলে?

-আমি বেয়াদবী করেছি?

-আমার জুতোর পাশে তোমার জুতো রেখেছ! আমার হাতে চুমু খাওনি! আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম দাওনি! আমার কুনিয়ত ধরে সম্বোধন করোনি! আবার অনুমতি ছাড়াই পাশে বসে গেছো!

-ও এই ব্যাপার! ঠিক আছে ব্যখ্যা দিচ্ছি!

= প্রথমত: আমার জুতো তোমার জুতোর সাথে রেখেছি, আমি প্রতিদিন আল্লাহ ঘরে এসে পাঁচবার জুতো যেখানে ইচ্ছা খুলে রাখি। কই তিনি তো কোনদিন আমার প্রতি রাগ করেননি! শাস্তির ভয় দেখাননি?

= দ্বিতীয়ত: তোমার হাতে চুমু খাইনি! কারণ আমি আমি আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর কাছে শুনেছি, নিজের স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া আর কারো হাতে চুমু খাওয়া ঠিক নয়

= তৃতীয়ত: আমি তোমাকে আমীরুল মুমিনীন (মুমিনদের আমীর) বলে সম্বোধন করিনি! কারণ মুমিনদের সকলেই যে তোমাকে আমীর হিশেবে পছন্দ করে এমন নয়। এখন তোমাকে সমস্ত মুমিনের আমীর বললে মিথ্যা কথা হয়ে যাবে না!

= চতুর্থত: আমি তোমাকে কুনিয়ত ধরে সম্বোধন না করে, সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছি। আল্লাহ তা'আলাও সমস্ত নবীকে তাদের নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন। উল্টো আল্লাহ ও তার রাসূলের জঘন্যতম দুশমন 'আবু লাহাব'-এর কুনিয়ত ব্যবহার করে আলোচনা করেছেন।

= পঞ্চমত: আমি তোমার পাশেই বসে গেছি, কারণ আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.) বলেছেন: তুমি কোনও জাহান্নামী লোককে দেখতে চাইলে দেখো এমন লোককে, যে নিজে বসে আছে অথচ তার চারপাশে লোকেরা তার ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

-আচ্ছা আচ্ছা! ঠিক আছে! এখন আমাকে কিছু নসীহত করো!

-নসীহত করবো? তাহলে শোন! আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর কাছে শুনেছি, জাহান্নামে বিরাট বিরাট সাপ-বিচ্ছু থাকবে! যেসব শাসকেরা তাদের প্রজাদের ওপর জুলুম করবে, সাপ-বিচ্ছুগুলো তাদেরকে দংশন করতে থাকবে!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৩

ইউজীবুল মুদতার্‌রা!

শায়খ গাযালী তার জীবনের গল্প করতে গিয়ে বলেন,

-আমি তখন আযহারে পড়ি। জরুরী টেলিগ্রাম এলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি যেতে হবে। গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে, নইলে এভাবে খবর পাঠানো হতো না। মনের ঈষাণ কোণে নানারকম দুশ্চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করলো। না জানি কী হয়েছে!

এসব ভাবতে ভাবতে ব্যাগ গুছিয়ে তড়িঘড়ি রওয়ানা দিলাম। বাড়ির কাছে যেতেই দূর থেকে আমাদের দোকানটা ঝাঁপ ফেলা দেখলাম। কী ব্যাপার! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়, শীত-গ্রীষ্ম যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশেও দোকান বন্ধ থাকে না! তবে আব্বুর কিছু হয়েছে? নাকি আম্মুর! উফ! আর ভাবতে পারছিলাম না। সাতপাঁচ ভেবে ভেবে মন হয়রান হয়ে গেলো। উঠানে পা দিতেই মা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি সাধারণত কাঁদেন না, হাউমাউ করে কেঁদে যা বললেন, সংক্ষেপে একটা কথাই বলা যায়:

-আব্বু মারা যাচ্ছেন!

বলা নেই কওয়া নেই, এমন সুস্থ-সবল মানুষটা মরে যাবে! তাকদীরের ফয়সালা আল্লাহর হাতে! তবুও হুট করে এভাবে চলে যাওয়া আপনজনের জন্যে মানতে কষ্ট হওয়ারই কথা! ব্যাগটা ওখানেই রেখে দৌড়ে আব্বুর ঘরে গেলাম। মড়ার মতো পড়ে আছেন। শীর্ণ দেহে জীবনের 'প্রানস্পন্দন' অতিক্ষীণ! দেহ পিঞ্জরে কোনও মতে প্রাণের আভাস ধুকপুক করছে! কী দেখে গেলাম ক'দিন আগে, আর এখন কী দেখছি! নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো!

কী আর করা! মেনে নিতেই হবে! মিশরের অজপাড়াগাঁয় ভাল চিকিৎসা যে করাব সেটারও জো নেই। হাতে টাকাও নেই। অগত্যা গ্রামের টোটকাই চলতে থাকলো। লতাপাতার ঘোঁট। মনের প্রশান্তি ছাড়া কিছু নয়। না হলে শরীরের যা হালত! কায়রো নিয়ে গেলেও কিছু হবে কি না সন্দেহ!

সংসারের হাল ধরতে হলো। পরদিন থেকে দোকান খুলে ব্যবসায় লেগে গেলাম। বেচা-বিক্রি টুকটাক যা হয়, সব আব্বুর ওষুধপথ্যেই চলে যায়!

কোনও উন্নতি নেই! দিনদিন আরও পড়তির দিকে! ঘাটতির দিকে! হাল ছেড়ে দিলে চলবে কী করে! আমরা সাধ্যানুযায়ী যুঝে যেতে লাগলাম।

একদিন পড়ন্ত দুপুরে দোকানে বসে আছি! ঝিমুনিও এসেছিল কিছুটা! মানুষজনের চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে! গরমের প্রচণ্ড দাবদাহে চরাচর কুঠুরিবদ্ধ! যে যার নিরাপদ আলয়ে শীতলতা খুঁজছে! একজন লোক এল। অতিপ্রয়োজনীয় কিছু আনাজপাতি কিনল। দাম দেয়ার সময় বললো:

-বাবা! আমার কাছে দাম চুকানোর মতো একটা কানাকড়িও নেই! তুমি বিশ্বাস করো, আগামীকাল সকাল সকাল এসে দামটা দিয়ে যাবো! মোটেও দেরী হবে না।

লোকটার হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম, আগামীকাল কেন আগামী মাসেও মূল্য পরিশোধ করার সামর্থ্য হবে না। তবুও বললাম,

-ঠিক আছে, নিয়ে যান। আরো কিছু লাগলে বলতে পারেন!

-না না, আর কিছু লাগবে না! বাড়িতে বাচ্চারা আজ কয়েকদিন ধরে না খেয়ে আছে তো! তাই বাধ্য হয়ে বাকী করতে এলাম!

সে চলে যাওয়ার পর, আমার মনে হলো,

-লোকটাকে যা দিয়েছি, সেটাকে আমি সদকা হিশেবেও ধরতে পারি! সত্যি সত্যি দাম চুকোতে এলেও গ্রহণ করবো না!

কী ভেবে দোকানের ঝাঁপ ফেলে, এককোণে গিয়ে বসলাম। আল্লাহর কাছে অঝোরে কেঁদে কেঁদে বললাম:

-আপনার নবীজি বলে গেছেন, 'তোমরা তোমাদের রুগীদের চিকিৎসা সদকার মাধ্যমে করো'! আপনি এই সামান্য সদকার মাধ্যমে, আব্বুর অসুখটা ভাল করে দিন! এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করে গেলাম।

বাড়ি ফিরে আজ ভিন্ন এক চিত্র দেখতে পেলাম। আব্বু ঘর থেকে বের হতে পারেন না, তিনি দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। আম্মু বললেন:

-আজ দুপুরে হঠাৎ করে তোর আব্বু বললো, অনেক দিন তো শুয়ে শুয়ে ঘরের কড়িকাঠ গুণছি, আর অথর্ব জীবন ভাল লাগছে না, আমাকে ধরে একটু বাইরে নিয়ে বসিয়ে দাও! গায়ে আলো-বাতাস লাগুক!

আমার চট করে মনে পড়ে গেলো। বুঝতে পারলাম: আল্লাহই এটা করেছেন। তিনি তার বান্দার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি আসলেই 'ইউজীবুল মুদতাররা': অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৪

পোলাউ জিন্দাবাদ!

বোম্বাইয়ের এক ধনাঢ্য মুসলমান। এক বিশেষ উপলক্ষ্যে ভোজসভার আযোজন করলেন। সমাজের গণ্যামান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেয়া হলো। শাসকশ্রেণীর একজন ইংরেজকেও বিশেষ অতিথি হিশেবে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

দস্তরখানে হরেক কিসিমের খাবার পরিবেশন করা হলো। নানা মুখরোচক খাবারের ঘ্রাণে চারদিক ম ম করতে লাগল। গৃহকর্তা ছিলেন রইস আদমী। মোঘল রাজপরিবারে খাবার থেকে শুরু করে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মুসলিম ঘরানার রান্নাবান্নার সাথেও সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তারই বিশেষ উদ্যেগে-উৎসাহে অভিনব এক ধরনের পোলাউ রান্না করা হলো। দেশী-বিদেশী সবাই খুবই মজা করে বিশেষ পোলাউ খেলো। ফিরিঙ্গি সাহেবও সাগ্রহে বারবার চেয়ে নিয়ে পোলাউ খেলেন। চোখেমুখে বেশ তারীফ আর পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল তার। খাচ্ছিলেন আর নাইস নাইস-ডিল্লিশাস করছিলেন।

খানাপিনার আসর শেষ হলে আসর জমে উঠলো নানা আলোচনায়। একজন ইংরেজের উপস্থিতিতে কথাবার্তার মোড় বারবার লাগামপ্রাপ্ত হলেও বিষয়ের তো অভাব নেই। ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতে কাজ করার সুবাদে স্থানীয় ভাষা ভালোই বুঝতে পারতেন। তিনিও সবার দিলখোলা আড্ডা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। তবে নিজে কিছু বলছিলেন না। চুপ থাকার বিষয়টা চৌকস গৃহকর্তার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি শশব্যস্তে বারবার এসে জানতে চাচ্ছিলেন:

-স্যার, কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো? আনইজি ফিল করছেন না তো!

-না না, বেশ ভালোই লাগছে। উপভোগ করছি। এর আগে আমি কোনও ভারতীয় মুসলিমের কাছ থেকে ঘরোয়া দাওয়াত পাইনি! আপনার আহ্বানটা ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। লোভনীয়। আমি দীর্ঘদিন থেকেই মনে মনে এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

-নির্বিঘ্নে বলুন স্যার!

-আমি বহু হিন্দু পরিবারে চীফ গেস্ট হিশেবে গিয়েছি। উঁচু উঁচু তবকার। তারা আমাকে সেই ইউরোপিয়ান ডিশ দিয়েই আপ্যায়ন করেছে। দেশীয়

ডিশের সাথে দেখাই মেলেনি। তাই আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল, হিন্দুদের মনে হয় নিজস্ব কোনও 'খাবারসংস্কৃতি' নেই। এজন্য আলাদা কোনও রেসিপি বা ঢঙও নেই। কিন্তু আপনাদের এখানে এসে দেখলাম, আমাদের ইউরোপের রন্ধনপ্রক্রিয়ার সাথে আপনাদের মুসলমানদের কোনই মিল নেই। এটা 'এবসলুটলি' ইউনিক একটা রন্ধনঘরানা। আমি একজন ভোজনরসিক মানুষ! একটা খাবার খেলেই বুঝতে পারি, এটার রন্ধনপ্রক্রিয়া সদ্য আবিষ্কৃত নাকি দীর্ঘদিনের পুরনো! আপনার ঘরে খাওয়া প্রায় প্রতিটি রেসিপিই শত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকেই গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছে। আরও একটা বিষয় আমাকে বেশ ভাবিতে তুলছে!

-কী সেটা?

-এখানকার অন্য দাওয়াত মানে নেটিভ হিন্দু আর আমাদের ইউরোপিয়ান পার্টিগুলোতে খানা খাওয়ার পর যে মানসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, আপনার ঘরে খাওয়ার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক 'ফিলিংস' অনুভব করছি।

-সেটা কেমন?

-মনে হচ্ছে আমি আসলে কিছু খাইনি, আবার ক্ষুধার্তও নই। শরীর ও মনে কেমন এক স্ফূর্তি আর ফুরফুরে ভাব খেলছে। মন-মেজাজে এক ধরনের আনন্দ-আনন্দ আর 'স্যাটিসফ্যাকশন' বয়ে যাচ্ছে।

-মাই প্লেজার স্যার!

-আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

-আপনাদের খাবার খেয়ে যদি এমনধারার ঝরঝরে ভাব হয়, আপনাদের প্রতিটি কাজ আইনিম 'রিচুয়াল' পালন করলেও কি এমন 'এনজেলিক' নির্ভারতা আসে?

-জি স্যার! খাবার তো স্যার অত্যন্ত গৌণ বিষয়। আপনি স্যার আমাদের 'কালিমায়ে তাওহীদ' মনেপ্রাণে বিশ্বাস নিয়ে পড়লে, এক ওয়াক্ত নামায পড়লে, যে অনির্বচনীয় অনুভূতিময় অভিজ্ঞতা লাভ করবেন, সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

-তাহলে তুমি সেই ব্যবস্থাই করো!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৫

মহীরূহ!

ছেলেটার নামে খালি অভিযোগ আর অভিযোগ! শিক্ষক পড়া দিচ্ছেন, আর তাকে দেখা যাচ্ছে রাবার দিয়ে পাশের জনকে কাগজের তৈরি বুলেট ছুঁড়ছে। নয়তো আরেকজনকে চিমটি কাটছে। বাড়ির কাজ এলোমেলো করে দিচ্ছে। মারলেও কিছু হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো বন্ধ। আবার যে কে সেই। এটুকু হলে না হয় সারতো। কিন্তু সমস্যা হলো তার আরও সাঙ্গপাঙ্গ তৈরী হয়ে গেছে। প্রভাবশালী ঘরের সন্তান। বাদ দেয়া যাবে না। ছাঁটাই করা যাবে না। মারাও যাবে না। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে। শিক্ষকরা এটাও বলেন, ছেলেটা মেধাবী। শুধু দুষ্টুমিটা ছাড়াতে পারলেই কাজ হবে। অনেক সময় দুষ্টুমিটা আর দুষ্টুমির পর্যায়ে থাকে না। সীমা ছাড়িয়ে মারাত্মক অপরাধের পর্যায়ে চলে যায়।

অভিজ্ঞ একজন শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেয়া হলো ক্লাসটিচার হিশেবে। তিনি যদি কিছু করতে পারেন। প্রথম কিছুদিন এমনি এমনি চলে গেলো। দুষ্ট ছেলের দলকে ভালোভাবে স্টাডি করলেন। কোথায় যায়, কী করে স-ব।

এর মধ্যে অবশ্য অনেক বিচার এসে জমা হয়েছে। সাধ্যমতো বুঝিয়ে-শুনিয়ে সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন। খুব একটা ফল পাওয়া না গেলেও, দুষ্ট ছেলেগুলোর সাথে হালকা একটা বোঝাপড়া তৈরী হয়েছে।

আগের ক্লাসটিচাররা বিচার এলেই হুমকি-ধমকি শুরু করে দিতেন। নানাবিধ চাপের কারণে মূল দুষ্টটাকে না মারলেও অন্যরা রেহাই পেতো না। এখন বারবার বোঝানোর পর তাদের এখনকার মানসিকতা হলো,

-আপু! আমরা ভাল হতে চাই! কিন্তু কখন যে দুষ্টুমি মাথায় চেপে বসে টের পাই না।

স্কুলের বাগানের কাজের দায়িত্ব পড়লো শিক্ষিকার ওপর। তিনি ক্লাসের ছাত্রদেরকে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে গেলেন। দুষ্ট ছেলেগুলোকে একটা দলে রাখলেন। তাদেরকে প্রথমে কাজে নামতে বললেন:

-প্রথমে আগাছাগুলো সাফ করে ফেলো। ছোট ছোট ঘাসগুলো টেনে টেনে তোল!

ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। হুড়ুদ্দুম করে অল্প সময়েই বাগানের সব আগাছা উৎপাটিত হলো। শিক্ষিকা এসে বললেন,

-ঘাসগুলো তুলতে তোমাদের কোনও কষ্ট হয়েছে?

-জি না ম্যাডাম!

-ঠিক আছে, এবার বাগানের বড় গাছগুলো তুলে ফেলো তো!

- সেগুলো কেন?

-আমরা নতুন করে গাছ লাগাবো!

ছেলেরা আবার হৈ হৈ করে নেমে পড়লো। কিন্তু দুয়েকটা গাছ ছাড়া সব গাছই থেকে গেলো। দাঁত বসানো গেলো না।

-কী হলো বড়গুলো তুলতে পারলে না!

-ওগুলো তোলা যাবে না। শেকড় বহুদূর গজিয়ে গেছে।

-দেখেছো! প্রথমে নরম দূর্বঘাসগুলো কী সহজেই তুলে ফেললে! কিভাবে সম্ভব হলো?

-সেগুলোর শেকড় নরম ছিল!

-ঠিক বলেছ। তোমাদের মধ্যেও কিছু দুষ্ট অভ্যেস আছে। তোমাদের বয়েস কম হওয়ার কারণে, অভ্যেসগুলো অতটা শেকড় ছড়াতে পারেনি। হ্যাঁচকা টান দিলেই উঠে আসবে। চেষ্টা করো, দেখবে অল্পতেই তোমাদের বদভ্যেসগুলো দূর হয়ে যাবে।

-বড় গাছগুলো ম্যাডাম?

-সেগুলো হলো তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভালো ভালো অভ্যেস। দেখছো না শত টানাটানি করেও গাছগুলো ওপড়াতে পেরেছো?

-জি না!

-তোমাদের মনের সুন্দর দিকগুলোও এমনি। আচ্ছা বলো তো পৃথিবীতে ভালোর শক্তি বেশি না মন্দের?

-ভালোর শক্তি বেশি!

-ঠিক বলেছি। তোমরা চেষ্টা করো দেখবে, দুষ্ট ইচ্ছাগুলোও দূর্বাঘাসের মতো উপড়ে উঠে আসবে। আর সুন্দর ইচ্ছাগুলো তোমাদের মনের গহীনে থেকে যাবে। চাইলেও উঠিয়ে আনতে পারবে না। মনে থাকবে?

-জি আপুমণি!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৬

জান্নাতী ইফতারি!

ড. আবদুর রাহমান ময়দানী। ১৯২৭-২০০৪। দিমাশকের মানুষ। আযহারে পড়াশুনা। সৌদিতে বসবাস ও কর্মজীবন। ছাত্রজীবন থেকেই তার রচনাবলীর সাথে পরিচয় ছিল। ভালোবাসা ছিল। কুরআন কারীম, ইতিহাস, দাওয়া ইত্যাদি নিয়েই লেখালেখি করতেন। সৌদি আরবের বড় বড় দুই ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তাদাব্বুরে কুরআন নিয়ে, তার অসাধারণ একটা কিতাব সবসময় আমার টেবিলে থাকে। বাইরে বের হলে ট্যাবে থাকে। তাঁর স্ত্রীও উম্মুল কুরা ভার্সিটির অধ্যাপিকা। স্বামীকে নিয়ে তিনি এক অসাধারণ বই লিখেছেন। দেড়শ পৃষ্ঠার। তাকে কেন যেন ডক্টর বলতে ইচ্ছে হয় না। মনে তিনি আমাদের দেশের পরিভাষায় একজন 'আলেম'। তার জীবনেরই একটা ঘটনা আজ বলবো। তিনি বলেন,

-রমজান মাস চলছে। মসজিদের দরস শেষ করে বাসার পথে রওয়ানা দিলাম। ইফতার বাসাতেই করার খেয়াল। বউ-বাচ্চারা অপেক্ষা করছে। একটু পা চালিয়ে হাঁটছিলাম। একজন লোক দৌড়ে এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পর চিনতে পারলাম। লোকটা আমার দরসে মাঝেমধ্যে বসে। নিতান্ত সাধারণ একজন লোক। বেশভূষায় মনে হয় একজন শ্রমিক।

-কিছু বলবে?

-জি শায়খ! আমার একটা আর্জি ছিলো।

-তাড়াতাড়ি বলো, আমাকে ইফতারির আগে বাসায় পৌঁছতে হবে।

-বলছিলাম কি, আজ যদি ইফতারটা আমাদের বাসায় সারতেন!

-এটা তো সম্ভব নয়! ঘরে সবাই যে অপেক্ষা করে থাকবে!

-শায়খ! অনেক দিনের ইচ্ছা! আপনাকে একা পাই না। আমার পরিবারেরও খুব ইচ্ছা; আপনাকে একদিন ইফতার করাব। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে, নবীর সুন্নাতের দিকে তাকিয়ে হলেও দাওয়াতটা গ্রহণ করুন!

লোকটা এমন করে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, না গেলেই বরং খারাপ লাগবে। নবীজির সুন্নাতের দোহাই দিল। আল্লাহর কথা বললো। না গেলে

গুনাহ হবে বলেই মনে হলো। সম্মতি দিলাম। অনেক দূর হাঁটার, অলিগলি পেরিয়ে একটা প্রায় অন্ধকার কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। ঘর বলতে, একলোকের ছাদে কোনও রকমে তৈরী করা ঝুপড়ি ঘর। নড়বড়ে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদবাড়িতে উঠে এলাম। সিঁড়িটাও এমন, একসাথে দুইজন ওঠা যায় না। ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা।

ছোট্ট অপরিসর ছাদেঃ রান্নাঘর আর শোয়ার ঘর। ব্যস, এই নিয়ে সংসার। দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত দরিদ্র এক পরিবারের আবাস। তবুও লোকটা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। চোখেমুখে খুশির আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমাকে কোথায় না কোথায় বসাবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। তার উচ্ছ্বাস দেখে কিছুটা কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম।

আমাকে বসিয়ে গল্প জুড়লো।

-শায়খ! ছাদটা অনেক কষ্ট করে কিনেছি। এই ঘর ভাঙা পর্যন্ত। নিজের একটা ঘর থাকা খুবই আনন্দের কী বলেন! ছাদে বাসা হওয়াতে, আমরা সকাল-সন্ধ্যা আলো পাই। সকালে এই চকিতে বসেই আমি আর স্ত্রী কুরআন তেলাওয়াত করি। বিকেলেও 'ও' এখানে বসে বসেই কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। আলোর জন্যে জানলার ধারে যেতে হয় না। এমন আরামদায়ক ঘর পাওয়া আল্লাহর খাস রহমত নয় কি?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই খাস রহমত।

-আল্লাহ আমাদেরকে কোনও ছেলেপিলে দেননি। আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। তিনি ভাল মনে করেছেন সন্তানের নেয়ামত দান করেননি। আমার আর ওর কী করার আছে! আল্লাহর ফায়সালায় আমরা দুজনই খুবই খুশি!

সরল মানুষটা আমাকে বসিয়েই গল্প জুড়ে দিয়েছে। স্ত্রী বোধহয় রান্নাঘরে ছিল। সেখান থেকে একটা আওয়াজ এল। লোকটা যেন সম্বিত ফিরে পেলো। জিভে কামড় দিয়ে, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে দৌড়ে ভেতরে গেলো। হালকা একটা ভাঙা বোর্ড দিয়ে রান্নাঘরকে আলাদা করা হয়েছে। লোকটা তার স্ত্রীর সাথে নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করলো। আমি বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। তারা আস্তে কথা বললেও, আমি সব কথা শুনে ফেলছিলাম। ভেতরে যেতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করলোঃ

-আপনি শায়খকে আজ নিয়ে আসবেন আগে বলেননি যে!

-কী করবো বলো! ওনাকে যে সুযোগ মতো পাই না।

-এখন ঘরে যে কিছুই নেই! কী দিয়ে ইফতার করাই! পুরনো শিমের বিচি আছে! সেটা সিদ্ধ করতেও আধা ঘন্টা লেগে যাবে!

আমি তখন গলা খাঁকারি দিয়ে লোকটাকে ডাকলাম। তাকে বুঝতে দিলাম না আমি তাদের সব কথা শুনতে পেয়েছি!

-ভাই, আমার একটা কথা আছে!

-জি শায়খ!

-আমি ইফতারির সময় খেজুর আর পানি খাই! আজ বেশি কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও নেই। তবে মাগরিবের পর আমি কিছু বিরদ (ওযীফা) পাঠ করি, সেটা আদায় করতে আধা ঘণ্টা সময় লাগে! তারপর আমি সাধারণত শীমের বিচি বা আলুসেদ্ধ খাই। এর বেশি কিছু আমার লাগবে না!

লোকটা আমার কথা শুনে এত বেশি খুশি হলো, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। কৃতজ্ঞতায় আমার হাত চেপে ধরলো। পরক্ষণেই দৌড়ে ভেতরে গেলো। কথা মতো ইফতারি হাজির করলো। সবশেষ করে তারাবীহ পড়তে চলে এলাম।

সেই দাওয়াতের কয়েক দিন পরের কথা। আমার দরসে বসে এক বড়লোক তার বাগানবাড়িতে ইফতারির দাওয়াত দিল। সময়মতো গাড়ি এল। আসর আদায় করেই রওয়ানা হয়ে গেলাম। বিশাল এক প্রাসাদের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। আমি গাড়ি থেকে নামতেই মেযবান সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল। রাজকীয় আয়োজন। তার বাগানবাড়িটাও দেখার মতো। সুইমিং পুল। ছোটখাট চিড়িয়াখানা। নানা জাতের ফল-ফুলগাছের মহাসমারোহ!

ইফতারির জন্যে কতো পদের নাস্তার যে ব্যবস্থা হলো, হিশেব নেই। কিন্তু এত জাঁকজমকের মধ্যেও দেখলাম, মেযবান ভদ্রলোক কেমন বিষণ্ন হয়ে আছেন। আমার ক'দিন আগের সেই ইফতারির কথা মনে পড়লো। চোখের সামনে গরীব মানুষ পরিতৃপ্ত-সন্তুষ্ট চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছিল। ফেরার আগে গাড়িতে ওঠার আগে, মেযবানকে বাগানের একপাশে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলাম:

-আপনাকে কেমন অবসন্ন লাগছে!

-শায়খ! কী আর বলবো! আমার এত গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা-ধনদৌলত! কিন্তু তারপরও মনে একটুও শান্তি নেই।

-কেন, আপনার কোনও সন্তান নেই?

-আছে! না থাকলেই ভালো ছিল। এই যে আজ এতবড় একটা আয়োজন হলো, কই কোনও ছেলেকে দেখেছেন? সব ব্যাটা টাকা শেষ হলেই শুধু আমার কাছে আসে। যা চায় তাই দিতে হয়। না দিলে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায়! সবগুলো শকুনের মতো অপেক্ষা করছে, কবে আমি মরবো!

শায়খ! মাঝে মধ্যে মনে হয়, সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাই! এই দুঃসহ জীবনের ঘানি আর টানতে পারছি না।

লোকটাকে সান্ত্বনা দিয়ে গাড়িতে চড়লাম। বসে বসে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম,

= সেদিনের লোক আর আজকের লোকের মধ্যে কতো ফারাক! একজনের কিছু না থেকেও, কী অসম্ভব সুখী! আরেকজনের প্রায় সব থেকেও কী অসম্ভব দুঃখী!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৭

কর্জে হাসানাহ!

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হলো দু'জনের। দুবাই এয়ারপোর্টে চার ঘণ্টার ট্রানজিট। সেখানেই ওয়েটিং রুমে দুই বান্ধবীর দেখা। একজন আমেরিকা থেকে আসছে। আরেকজন ওমরা থেকে। কথাবার্তা বেশিদূর গড়াল না। আমেরিকা প্রবাসী বান্ধবীর বিমান ছেড়ে দিবে। মোবাইল নাম্বার বিনিময় করে আপাতত অতৃপ্ত মনে একে অপরকে বিদায় দিল।

দেশে ফেরার পর প্রাথমিক ব্যস্ততা কেটে গেলে, প্রবাসী বান্ধবী যোগযোগ করে বাসার ঠিকানা নিল। একদিন বেড়াতে গেলো দেশে থাকা বান্ধবীর বাসায়। ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেই অবাক! মনে মনে বললো:

-বিয়ের পর কী অবস্থা দেখে গেলাম। আর এখন! এ যে কল্পনাতীত! এত বড়লোক কিভাবে হলো!

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললো না। ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি অবাক হলো বান্ধবী এবং তার বরের ধার্মিকতা দেখে। কই বিয়ের আগে তো এত ধর্মকর্ম করতে দেখিনি। বিয়ের সময়ও স্বাভাবিক ছিল। মাঝখানের কয়েক বছর ব্যবধানে ধনে ও ধর্মে এত পরিবর্তন কিভাবে হলো?

ছোটবেলার খেলার সাথীকে আদর-আপ্যায়নে কোনও ঘাটতি রাখলো না। বিকেলে বান্ধবীর বর এলো। সরাসরি সামনে এলো না। আড়াল থেকেই কথা

সারলো। দু'জনে গল্প করতে বসলো। একথা সেকথার পর পরিবর্তনের কথা উঠলো! মেযবান বললো,

-বুঝতে পারছি, তোর মনে কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে।

-হ্যাঁ, নেয়ারই কথা। আমি যে অবস্থায় তোদেরকে দেখে গিয়েছি, তার সাথে মেলাতে পারছি না।

-আসলে তোর সাথে দেখা হয়েছে দশ বছর আগে। পরিবর্তনের জন্যে দশ বছর সময় খুব একটা কম নয়।

-তা ঠিক!

-ও অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে গিয়েছিল। যাওয়ার পথে ট্রেনে তার পাশের আসনে ছিলেন একজন মুরুব্বি। তিন চিল্লা দিয়ে ফিরছিলেন। দেশের বাইরে গিয়েছিলেন। ফিলিপাইনে। সম্পূর্ণ নিজের খরচে। জামীল অবাক! কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে এতদূর যায়! তাও কোনও ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়া! বিষয়টা তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল:

-এত টাকা কোথায় পেলেন?

-আল্লাহই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চাকুরি শেষ। জমানো টাকা ছিল কিছু। গিন্নিসহ হজ্জ করেছি। ইচ্ছা ছিল দেশের বাইরে সফরে যাবো, এবার তাওফীক হলো।

-আপনার সব টাকা তো শেষ করে ফেলেছেন। এখন চলবেন কী করে?

-কিভাবে চলবো সেটা নিয়ে ভাবার দায়িত্ব তো আমার নয়।

-কার?

-আল্লাহর। আমার দায়িত্ব হলো যথাযথভাবে তার ইবাদত করা। আরেকটা কারণে আমি রিযিকের জন্যে ভয় করি না।

-কী কারণে?

-আমি সারাজীবন আল্লাহকে 'কর্জে হাসানা' দিয়ে এসেছি! এখন আমি কষ্টে পড়ে গেলে আল্লাহ দেখবেন না, এটা কী করে হয়?

-কর্জে হাসানা কী?

-গরীব-দুঃখীকে নিঃস্বার্থভাবে দান করা। আমি আর গিন্নি সারাজীবন বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিয়ে এসেছি!

-পদ্ধতিটা কী?

-প্রতিদিন রাতের বেলা অফিস থেকে ফিরে এলে, আমার পকেটে খুচরো পয়সা থাকলে অথবা বাজার করার পর খুচরা পয়সা থাকলে একটা বাক্সে রেখে দিতাম। প্রতি জুমাবারে বাক্সটা খুলে, না গুণেই একটা খামে রেখে দিতাম। গিন্নি আগেই ঠিক করে রাখতো আমাদের পাড়ার কোনও বিধবার টাকা প্রয়োজন আছে কি না। আমি হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করে আসতাম বেডে কোনও গরীব মানুষ ভর্তি আছে কি না! কোনও বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা বা রিকশাওয়ালা কষ্টে আছে কি না!

এক সপ্তাহে একজনকে খামটা পৌঁছে দিতাম। কাউকে জানিয়ে, কাউকে না জানিয়ে। এভাবে বহু বছর ধরে আমলটা করেছি।

আল হামদুলিল্লাহ। সেজন্যই আমি নিশ্চিত আল্লাহ আমাকে কষ্টে ফেলবেন না। আর আমি এখনো একেবারে নিঃস্বও নই। বুড়োবুড়ি চলার মতো সংগতি আছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েরাও আছে।

-জামীল চট্টগ্রাম থেকে ফিরেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। আমি কতো মানা করলাম! শুনলো না। আমাকে শুধু বলল,

-আমি দুইটা কথা শিখে এসেছি! জীবনটাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই!

-দুইটা কথা কী?

এক: কুরআনের একটা আয়াত: যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিবে, আল্লাহ তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিবেন (হাদীদ:১১)

দুই: প্রতি সকালে দুইজন ফেরেশতা নেমে আসেন। একজন দু'আ করেন,

= ইয়া আল্লাহ! আপনি (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয়কারীকে খালাফ (উত্তম বিনিময়) দান করুন।

আরেকজন দু'আ করেন,

= ইয়া আল্লাহ! আপনি (সম্পদ) কুক্ষিগতকারীকে 'তালাফ' (বিনষ্টি) দিয়ে দিন! (মুসলিম)

-ও আস্তে আস্তে নামায পড়া শুরু করলো। প্রথম দিকে আমি রাগারাগি করেছি। বুড়ো আমার স্বামীকে এক রাতেই কী জাদু করে দিল! একজন মানুষ মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় এভাবে আমূল বদলে যেতে পারে আগে ধারণাও ছিল না।

পরে অবশ্য আস্তে আস্তে আমিও নামায-কলমা শুরু করলাম। মুরুব্বির কাছ থেকে শোনা আমলটাও খুব গুরুত্বের সাথে শুরু করেছি। প্রথম দিকে খুবই কষ্ট করে চলতে হয়েছে। কোনও কোনও দিন আল্লাহকে 'কর্জে হাসানা' এক টাকাও দিয়েছি। একদিন আট আনাও দিয়েছি। আস্তে আস্তে পরিমাণ বেড়েছে। ছেলেমেয়েদেরকেও বলেছি। ওরাও সাধ্যমতো রাখে।

-জামীল টাকাটা বাইরের কাউকে দান করতো না। পাড়ার মসজিদে বৈকালিক মক্তব চালু করলো। একজন শিক্ষক ঠিক করে দিল। তারপর যখন ব্যবসার আয় বেড়ে গেলো, পাশের মহল্লায় আরেকটা মক্তব চালু করলো। ওর কথা হলো, আমি কুরআন শিখতে পারিনি। কিন্তু আমার মতো গরীবরা যেন কুরআন শিখতে পারে। যে কথা আমি ত্রিশ পার হয়ে জেনেছি, ওরা ত্রিশ মাসের মাথায় শিখুক!

-আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আয়ে কোনও সুদের টাকা নেই। সুদের ভয়ে ও কোনও ব্যাংকে একাউন্টই করেনি। এক বন্ধুর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা আর অফিস থেকে পাওয়া সামান্য টাকা নিয়ে শুরু করেছিল।

-টাকা পয়সা জমা রাখতে হয় না!

-তার প্রয়োজন পড়ে না। ব্যবসার টাকা ব্যবসায় চয়ে যায়, অতিরিক্ত টাকা চলে যায় 'কর্জে হাসানায়'। জামীল বলে, সুদী ব্যাংকে না রেখে আল্লাহর ব্যাংকে জমা রাখলেই বেশি নিরাপদ! এই ব্যাংকের কোনও ছুটির দিন নেই। শুক্র-শনি নেই। যে কোন সময় জমা রাখা যায়। আবার ওঠানোও যায়! কোনও ঝামেলা ছাড়া! হিশেব রাখার ঝামেলাও নেই।

-আচানক বিপদাপদে?

-সেটার চিন্তা আমরা কেন করবো?

সুখময় দাম্পত্য!

-আমাদের পাড়ায় একটা মহিলা সমিতি আছে, জানো তো! সেখানে একটা নতুন ইভেন্ট খোলা হয়েছে।

-কিসের ইভেন্ট!

-'সুখময় দাম্পত্য' ইভেন্ট।

-সেটার কাজ কী?

-একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক মহিলাকে প্রধান করে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা যারা সদস্য আছি, তাদের সবাইকে একটা কাজ করতে হবে। প্রত্যেকে তাদের স্বামীদেরকে বলবে:

-আমার কোন কোনও অভ্যেস বা আচরণ তোমার অপছন্দ হয়, সেগুলো একটা চিরকুটে লিখে দাও!

-লেখার পর কী হবে?

-চিরকুটটা একটা খামে পুরে, মুখবন্ধ অবস্থায় মুরুব্বীর কাছে পেশ করবো।

-তারপর?

-উনি অন্যদের সাথে পরামর্শ করবেন। দোষগুলো কাটিয়ে উঠতে পরামর্শ দিবেন। আলাদা করে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিবেন।

-এসব ঘরের বিষয় বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? ঘরে ঘরেই তো সমাধান করে ফেলা যায়!

-তা হয়তো যায়। কিন্তু কয়জনই বা উদ্যোগী হবে! একসাথে হলে, সব স্বামীর কথাকে একত্র করলে, স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের মনোভাব বা চাহিদার সামগ্রিক একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

-একজনের দোষ আরেকজন জেনে যাবে না?

-না চিরকুটটা শুধু মুরুব্বী মহিলাই খুলবেন। এরপর তিনি আলাদা কাগজে সেগুলো নোট করে, নাম প্রকাশ না করে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান বের করবেন।

-সুন্দর উদ্যোগ! স্বামীদের নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই? সুখী হতে হলে দু'জনকেই এগিয়ে আসতে হবে!

-এটাও বিবেচনায় আছে। পাড়ার একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষকে স্বামীদের দায়িত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বামী আলাদা কামরায় গিয়ে স্ত্রী সম্পর্কে তার বক্তব্য লিখে, খামটা দিল। বিকেলে নারীদের একান্ত বৈঠকে স্বামীদের অভিযোগের ফিরিস্তি লিখতে লিখতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। একটা খাম সবার সবার নজর কাড়ল। তাকে লেখা আছে:

-আমার স্ত্রীর দোষগুণসহই আমি তাকে ভালোবাসি! আমি তারমধ্যে দোষণীয় কিছু দেখি না! তবে হ্যাঁ, সে ফেরেশতা নয়, আমিও নই।

নিয়ম ভঙ্গ করে, এই খামের চিরকুটটা সবার সামনে পড়া হলো। নাম উল্লেখ করেই! মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে। বেশির ভাগেরই মন খারাপ। কারণ অন্য স্বামীরা মনের সুখ মিটিয়ে স্ত্রীর দোষত্রুটি লিখেছে। তাদের মানুষটাও কি পারতো না এমন উদারতার পরিচয় দিতে!

পুরো পাড়ায় আদর্শ স্বামী হিশেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তাকেই পুরুষ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হল। প্রথম বৈঠকেই অন্য স্বামীরা ছেঁকে ধরলো:

-ভাইজান! আপনি কী আগুন জ্বালিয়ে দিলেন! ঘরে টেকাই দায় হয়ে পড়েছে!

-কেন রে ভাই!

-আমরা কেন আপনার মতো উদার হতে পারলাম না, উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে। গোমড়া মুখ সামলাতেই জান কোরবান হয়ে যাচ্ছে। আপনি ঘরে একজন ফেরেশতা পেয়েছেন বলে কি সবার ভাগ্যেই এমন জুটবে!

-ভুল বুঝেছেন! আমার ঘরনী একজন ফেরেশতা এমন নয়। তারও বলার মতো দোষ আছে।

-তাহলে লিখলেন না যে!

-আমি এক ওয়াজে শুনেছি, স্ত্রীর দোষত্রুটি ধরে সমালোচনার চেয়ে, তার ভালো দিকগুলোর স্বীকৃতি দিলেই বেশি লাভ। এতে সে উৎসাহিত হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। মন কষাকষিও হয় না। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরী হয়।

-আপনার স্ত্রীর কোনও দোষ নেই?

-আছে। আপনারা যেমন লিখেছেন, তেমন আমার লেখার মতোও প্রায় ছয়টা 'দোষ' ছিল। কিন্তু গতকাল আমি প্রশংসামূলক চিরকুটটা তাদের সভায় পাঠ করায় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

-কেমন?

-আমি তার যেসব আচরণ অপছন্দ করতাম, সেগুলো একদিনেই প্রায় কেটে গেছে। সে নিজ থেকেই জেনে নিয়েছে। আমি পরিষ্কার করে কিছু না বললেও, ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছি সে তার কোন কোন আচরণকে আরো উন্নত করতে পারে! সে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে! ভেঙে বলতে হয়নি। আমিও খুঁটে খুঁটে আমার দোষণীয় বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।

আর দোষক্রটির আলোচনা করলে সম্পর্কের মধ্যে আড়ষ্টতা চলে আসে। তার চেয়ে প্রশংসার পথ ধরলেই বেশি ফল পাওয়া যায়। এটা শুধু স্ত্রীর ক্ষেত্রেই নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

-তাই বলে দোষ থাকলেও বলবো না! শুধু প্রশংসাই করে যাবো!

-কেন বলবেন না! বলবেন তবে ঘুরিয়ে। সরাসরি নয়। সময় ও সুযোগ বুঝে!

জীবন জাগার গল্প : ৫০৯

খাবার-চিকিৎসা!

স্বামী মারা গেছেন সেই কবে। চল্লিশ পার হতে না হতেই। নতুন করে অন্য কারো ঘরনী হওয়ার বয়েস থাকলেও ইচ্ছে ছিল না রাফিয়া খানমের। বাকী জীবন মেয়েকে নিয়েই কাটিয়ে দেবেন এমনটাই ভেবে রেখেছিলেন। বেশী বয়েসে পাওয়া একমাত্র সন্তান। আদর-যত্ন একটু বেশিই ছিল। সারাক্ষণই সবে ধন নীলমণি মেয়েটাকে হারানোর ভয়। মেয়েই ছিল চব্বিশ ঘন্টার ব্যস্ততা।

মেয়েটা যে বিয়ের পর স্বামীর ঘরনী হয়ে যাবে এটা গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখেননি কখনো। মেয়ে পড়াশোনা শেষ করার পরই বিষয়টা প্রথম সামনে আসে। বিদেশে থাকা ভাই যখন ফোনে বললো:

-আমার একজন পাত্রী প্রয়োজন। তোর ভাবীর ইচ্ছে রুবাবাকেই পুত্রবধূ করবে।

-উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিয়ের পর যে বিদেশ চলে গেলে আমি একা থাকবো কী করে?

-তুই দেশে থাকবি কেন? তুইও চলে আসবি!

-আচ্ছা আমি রুবাবার সাথে কথা বলে পরে জানাব।

-রুবি! তোর সাথে একটা কথা ছিল!

-কী, বিয়ের প্রস্তাব এসেছে আবার!

-হুঁ!

-তোমাকে কত্তোবার বলেছি, আমি তোমাকে একা ফেলে রেখে বিয়ে করব না।

-তা কী করে হয়, বিয়ে তো তোকে করতেই হবে। শুধু মায়ের জন্যে আইবুড়ো হয়ে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। এই প্রস্তাবটা ভাল এবং যৌক্তিক। তোর ইচ্ছের সাথেও অনেকটা মিলে যায়। তুই আরও পড়াশুনা করতে চাচ্ছিস তো!

-জি! তা পাত্রটা কে শুনি?

-তোর চেনা। মারুফ।

-ওহ! বড় মামার ছেলে?

-জি।

খুব দ্রুত সবকিছু হয়ে গেলো। এক বছরের মাথায় কাগজপত্রও তৈরী হয়ে গেলো। মা-মেয়ের বিদায় কান্না দেখে ছেলে শেষমেষ বলতে বাধ্য হলো,

-ফুফি! আমি রুবাবাকে বরং রেখেই যাই। পরে তোমার কাগজপত্র হয়ে গেলে, একসাথে নিয়ে যাবে!

-নাহ্। যেভাবে সবকিছু ঠিক হয়েছে, সেভাবেই চলতে দে!

বাড়িটা এক লহমায় খাঁ খাঁ হয়ে গেলো। বুকটা খালি হয়ে গেল। মনে মনে আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন বাকি যে কয়টা দিন বাঁচেন, স্বামীর ভিটেতেই থাকবেন। মেয়েকে আটকে রাখার কোনও মানে হয় না। দুই কাল গিয়ে এককালে গিয়ে জীবন ঠেকেছে।

কিন্তু মেয়ের সাথে জীবনযাপন অনেকটা অভ্যেসের মতো হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে শরীরের কোনও এক অঙ্গই যেন নেই হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার রুচি চলে গেল। ঘুম কমে গেল। মনটা সারক্ষণই বিষণ্ন হয়ে থাকলো। মেয়ের সাথে ফোনে কথা বললে, মনটা কিছুক্ষণ ভাল থাকে। তারপর আবার যে কে সেই। শরীর ভেঙে পড়লো। শেষতক হাসাপাতালেই ভর্তি করতে হলো। মেয়ে যাওয়ার আগে বুদ্ধি করে দূর সম্পর্কের আত্মীয়াকে রেখে

গিয়েছিল। সেই পাশের বাসার লোকজন ডেকে যাবতীয় ব্যবস্থা করলো।

হাসপাতালে কয়েকদিন ভর্তি থাকার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। এখন উঠতে বসতে পারেন। খাওয়ারও রুচি ফিরেছে। কিন্তু হাসপাতালের খাবার যে মুখে রোচে না। তাই বাসা থেকেই খাবার আনতে হয়। একদিন খাবার খেয়ে বাটি ফেরত পাঠানোর সময় একজন আয়া এসে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললো,

-আপনার তো অনেক খাবার বেঁচে যায়। যদি কিছু মনে না করেন, বাকি খাবারটা কি আমরা আরেকজন রুগিকে দিতে পারি?

-অবশ্যই দিতে পারেন। আমার বাসায় এই খাবার খাওয়ার মতো লোক নেই। ফেলেই দিতে হয়।

দুপুরে খাবার নিয়ে এলে বলে দিলেন এরপর থেকে খাবারের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে আনতে। আর খোঁজ নিবে হাসপাতালে খাবারে কষ্ট পায় এমন কেউ আছে কি না!

-জি আম্মা! কয়েকজন আছে। একজন বৃদ্ধ মুয়াজ্জিন আছেন। তিনি আজ অনেকদিন যাবত অসুস্থ। ইহজনমে কেউ নেই। ভিন দেশের মানুষ। অনেকদিন ধরে আজান দিয়েছেন। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর, তার দেখাশোনা করার কেউ নেই। তিনি হাসপাতালের খাবার খেতে পারেন না।

সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এলেন রাফিয়া খানম। একদিন সময় লাগিয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করে নিলেন। প্রথমেই মুয়াজ্জিন সাহেবের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তিনবেলা খাবার নিজেই রান্না করে পাঠাতে শুরু করলেন। ছোট্ট এক ছেলেকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন।

পাশাপাশি আশেপাশে আরও খোঁজখবর করলেন, কেউ খাবারের কষ্টে আছে কি না। প্রতি বেলায় তিনচার জনের খাবার অতিরিক্ত খাবার রান্না করতে শুরু করলেন। বিশেষ পদ্ধতির প্যাকেটে করে খাবার বিতরণ করতে শুরু করলেন। পাহারাদার-দারোয়ান এবং এই শ্রেণীর আরো যারা আছে, একেকবেলা একেকজনের জন্যে।

টাকাপয়সার তো অভাব নেই। এক মেয়েই সবকিছুর মালিক হবে। এখন মেয়েরও টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে মানুষের যদি কিছু কাজে লাগে! মৃত স্বামীর জন্যে সদকায়ে জারিয়া হবে।

আগে মা অভিযোগ করতেন মেয়েকে ঠিকমতো ফোনে পাওয়া যায় না। এখন উল্টো মেয়ের অভিযোগ করে মা তার সাথে আগের মতো লম্বা সময় নিয়ে কথা বলে না। একটুপরই বলে ওঠে, কাজ আছে। অতো কী কাজ?

অল্প কিছুদিন পরই দেখা গেলো, মুয়াজ্জিন সাহেব পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মসজিদে ফিরেছেন। ডাক্তার-নার্স সবাই তো অবাক। রাফিয়া খানমের মনে হলো, নিশ্চয় পুষ্টিকর খাবার পেয়েই এমনটা হয়েছে। তার মাথায় আরেকটা চিন্তা এলো, হাসপাতালে যারা দূরদূরান্ত থেকে আসে তাদের খাবারের ভীষণ সমস্যা হয়। তাদের সবার জন্যে না হলেও নিয়মিত একজনের দায়িত্ব তো আমি নিতে পারি। কাজটা শুরু করার পর দেখা গেলো, দীর্ঘদিন ধরে বেডে শুয়ে আছে, ভাল খাবার কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই এমন কারো জন্যে খাবার পাঠাতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে তারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। বেশ উৎসাহজনক।

এজন্য তিনি মুয়াজ্জিন সাহেবের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। ঠিক করলেন নিয়মিত মুয়াজ্জিন সাহেবের জন্যে খাবার পাঠাবেন। প্রতি ওয়াক্তে যখন আযানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসে, তার মনে বেশ পুলকমাখা শুকরিয়া জাগে, অত্র এলাকায় মানুষের মসজিদে যাওয়ার পেছনে তারও ক্ষুদ্র অবদান আছে! আলহামদুলিল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৫১০

জাফরানী মা

আমরা সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম, কখন ঈদ আসবে। পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে ভালোমন্দ রান্না হবে, আমরাও কিছুটা ভাগ পাবো। প্রায় দিনই ঘরে চুলা জ্বলতো না। পেটের ক্ষুধা নিয়েই ঘুমুতে যেতাম।

আমরা ঈদের পাশাপাশি অপেক্ষা করতাম কখন সেপ্টেম্বর মাস আসবে। কারণ তখন জাফরান ফুল তোলার পালা। আমাদের মাগরিব (মরক্কো) জাফরান উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে আছে। প্রথমে আছে ইরান। দেশের ৯০% ভাগ জাফরান উৎপাদিত হয় আমাদের তালাভীনে। সরকারী হিশেবে প্রায় ৪টন। ২৪ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের। আমরা জাফরানকে বলি আয যাহাবুল আহমার বা লাল সোনা। মার্চ থেকে শুরু হয় জাফরান চাষের

কার্যক্রম। আব্বু জমিদারদের ক্ষেতে মুনীষ খাটতেন। সেপ্টেম্বরে ফসল জাফরান বেতন হতো।

এরপর দুয়েক মাস সংসার চলতো কোনও রকমে। তারপর আবার যে কে সেই। আব্বু অভাবের তাড়নায় দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িয়ে থাকতেন। মদের নেশাও করতেন। নেশায় চুর হয়ে ঘরে ফিরতেন। খাবার চাইতেন। দিতে না পারলে সবাইকে পশুর পতো পেটাতেন। আমাদেরকে পেটাতে এলে আম্মু আগলে ধরতেন। তখন শুরু হতো আম্মুর ওপর অত্যাচার!

প্রতিটা রাতই আমাদের জন্যে বিভীষিকা হয়ে আসতো। সারাদিনের উপোস। তায় বাবার নির্মম প্রহার! মাঝে মধ্যে বাবা যেদিন নেশা করতেন না সামান্য খাবার নিয়ে ফিরতেন। নেশার কারণে আব্বু বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছেন। সংশোধিত হওয়ার বদলে তিনি আরও বে পরওয়া হয়ে গেছেন। ভাইবোন সবাই বাবার ভয়ে তটস্থ্ থাকতো। আমরা ছিলাম দশ ভাইবোন।

বাবার হাতে নিগৃহীত হতে হতে আম্মাও কেমন যেন হয়ে পড়েছিলেন। আব্বু ঘর ছেড়ে বের হওয়ার পর আম্মুও বের হয়ে যেতেন। প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। খাবারের আশায়। কাজের আশায়। পরিবারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

এর প্রভাব পড়ছিল আমাদের ওপর। আমরাও রাখালহীন মেষের মতো সারাদিন টো টো করতাম। আদর-যত্ন ছিল না। শাসন-তোষণ ছিল না। যে যার মতো ঘরে আসছে, বেরোচ্ছে। ভাইদের কেউ কেউ রাতে ঘরেও ফেরে না। রাস্তার পাশে কোথাও রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। তাহলে অন্তত মার থেকে বাঁচা যাবে। ভাইবোন সবাই কুরআনি মাদরাসা (মরক্কোর বিশেষ মক্তব) পার হয়ে প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পর আর পড়েনি। আল্লাহর খাস রহমতে আমি কুরআনি মাদরাসায় ভালো ফল করায় শায়খজির ব্যক্তিগত আগ্রহে মেয়েদের একটা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে পা ফেললাম। উন্নত মার্জিত সুশীল। আমার মধ্যে লেখাপড়া করার অদম্য আগ্রহ তৈরী হলো। শিক্ষকদের অপার-স্নেহ আর মমতায় আমি পারিবারিক শত নেতিবাচক বাধা সত্ত্বেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছলাম। তখন আমার বয়েস পনের।

একরাতে আব্বু একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। পাত্রের বয়েস ষাট। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। দিশেহারা হয়ে আম্মুর সহযোগিতা চাইলাম। আম্মু কোথায় সান্ত্বনা দিবেন তা নয় উল্টো বললেন,

-তুই অমত করলে তোর বাবা আমাকে সহ জবেহ করে দিবে! আর এখানে বিয়ে না হলে আমাদের সবাইকে রাস্তায় গিয়ে বসতে হবে। লোকটা নাকি তোর বাবাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

-কিভাবে সাহায্য করেছে?

-মদ খাইয়ে!

-আমার কিছু করার নেই। তোর বুকের পাটা থাকলে সরাসরি বাবাকে বলে দেখ!

অবশেষে একরাতে সাহস সঞ্চয় করে বাবার কাছে গেলাম। মনের কথা খুলে বললাম। সব শুনে আব্বু কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর নরম স্বরে বললেন,

-লোকটা আমার কাছে অনেক টাকা পাবে! তুই রাজী না হলে আমরা সবাই রাস্তায় বসবো! আর রাজী হলে, আমাদের সবার একটা হিল্লে হয়ে যাবে! সে কথা দিয়েছে। আমাকে ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দিবে। তোর কোনও সমস্যা হবে না। বয়েস একটু বেশি, না হলে টাকা পয়সার অভাব নেই। সুখেই থাকবি রে!

-আমি যে পড়তে চাই!

-অত পড়ে কী হবে! আমরা উপোস মরছি আর তুই কি না পড়ার কথা বলছিস! যা বলছি তাই হবে! আর কোনও কথা নয়।

বিয়ে হয়ে গেলো। স্বামীর বাড়ি গিয়ে উঠলাম। অল্প ক'দিন না যেতেই একটা ভুল ধারণা ভাঙল। এতদিন মনে করতাম আমার আব্বুই পৃথিবীতে একমাত্র নেশাদার। এখন তো দেখি তার চেয়েও বড় নেশাদার আছেন। জুয়ার নেশা। স্বামীর ঘরে একটানা পাঁচ বছর কেটে গেলো। বিশ বছর বয়েসেই তিন সন্তানের মা বনে গেলাম।

স্বামীর ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। আগের জমানো টাকা ভেঙে খাচ্ছিলেন। জুয়ার নেশার পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল দিন দিন। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলাম। কতো করে বোঝালাম! কে শোনে কার কথা!

আগেও তার মেজাজ খিটখিটে ছিল, এখন আরও! ঘরে বাইরে যার তার সাথে ঝগড়া জুড়ে দেন। এক রাতে লোকজনের হৈ চৈ শুনে ঘর থেকে বের হলাম। কয়েকজন ধরাধরি করে তার রক্তাক্ত দেহ ঘরে এনে রাখল। মুমূর্ষ অবস্থা! গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই। হাসপাতাল তো শহরে। টোটকা চিকিৎসা চলতে লাগলো। জানতে পারলাম, জুয়ার আখড়ায় ঝগড়া বাঁধিয়েছিলেন। একপর্যায়ে হাতাহাতি! এই বুড়ো বয়েসেও তিনি ছিলেন বেশ শক্তপোক্ত! এত মদ খেয়েও কিভাবে যেন শরীরটা ঠিক ছিল। তাই যুবকদেরকেও পরওয়া করতেন না। পাওনা টাকা নিয়েই কারও সাথে গ্রামের বাজারে ঝগড়া হয়েছিল। একপর্যায়ে দেনাদার সাঙ্গপাঙ্গসহ তার ওপর চড়াও হয়।

শুধু পাওনা টাকাই নয় অন্য কোনও আক্রোশও ছিল। নইলে এভাবে একটা বয়স্ক মানুষকে পেটায়। ছুরিকাঘাত করে! অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে তিনদিন পর মারা গেলেন। দ্বিতীয় দিন সকালে অবশ্য ভাল ডাক্তার আনা হয়েছিল। শরীরের অবস্থা দেখে তিনি বলেছিলেন শহরে নিয়ে যেতে! কিন্তু এতদূর যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না।

বিয়ের পর থেকে বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ ছিল না। আমার স্বামীই পছন্দ করতেন না। তবুও লুকিয়ে চুরিয়ে আম্মা আসতেন। ভাইয়েরা আসতো। আব্বাও আসতেন। সবারই একটা বায়না,

-তোর কাছে কিছু টাকা হবে!

তাদের স্বার্থপরতা দেখে মনটা বিষিয়ে উঠলেও মুখে কিছু বলতে পারতাম না। তারা তো অভাবের তাড়নাতেই এমন লজ্জার মাথা খেয়েছে। অপারগ হয়েই এসেছে।

.

স্বামী মারা যাওয়ার পরদিনই সবাই হাজির। আম্মার প্রথম জিজ্ঞাসা মৃত মেয়েজামাইকে নিয়ে নয়; ছিল,

-টাকাপয়সা কোথায় রেখে গেছে জানিস তো! নাকি সব আগের সংসারেরা দখল করে নিয়েছে!

খোঁজ নিয়ে যখন জানালাম কোনও টাকা-পয়সাই আমার জন্যে আলাদা করে রেখে যায়নি! তাদের মুখটা নিরাশায় পাণ্ডুর হয়ে গেলো। প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম। বাকী জীবনটা কিভাবে কাটাবো! সামনে দুইটা পথ খোলা,

-৫

ক) আবার কারো সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

খ) আয়-উপার্জনে নামা!

দুটোই মনঃপুত হলো না। আবার বিয়ে হলে সন্তানদের ঠিকমত মানুষ করতে পারবো তো? আয়-উপার্জনে নামলে আমাকে গুনাহের পথে যেতে হবে। সেটাও সম্ভব নয়। তাহলে? কোনও সমাধান বের হচ্ছিল না। আল্লাহর কাছে দু'আ করে যাচ্ছিলাম। বড় ছেলেটা কুরআনি মাদরাসায় পড়ে। আমার ছেলেবেলার ওস্তাযের কাছে! তিনি বলেছেন, ছেলে মনোযোগ দিয়ে পড়লে, দ্রুত হাফেয হয়ে যেতে পারবে! আমারও খুব ইচ্ছা আমার সন্তানেরা হাফেয হোক। আমিও আট পারার মতো মুখস্থ করেছিলাম। সেই কবে!

আমি যে মাধ্যমিক স্কুলে পড়তাম, সেটা ছিল আমাদের কুরআনি মাদরাসার পাশেই। সেখানকার বড় আপা একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। প্রস্তাব দিলেন,

-স্কুলে একজন আয়া লাগবে! তুমি কি কাজটা নিবে?

-জি আপা।

আল্লাহর অপ্রত্যাশিত রহমতে আপ্লুত হয়ে গেলাম। স্কুলে যেহেতু সার্বক্ষণিক চাকরি, আমাকে একটা ঘরও দেয়া হলো। সেখানে শুরু হলো নতুন জীবন। যতই সংসার জীবনে পাঁচটা বছর কাটুক, মনের গভীরে সব সময় লেখাপড়ার প্রতি অদম্য স্পৃহা ছিল। সুযোগ পেলেই আগের বইপত্র নাড়াচাড়া করতাম। কুরআন তিলাওয়াত ও হেফয করার চেষ্টা করতাম। আমার বুড়ো স্বামীও বোধ হয় একসময় ভালো লেখাপড়ার সাথে যুক্ত ছিলেন। তার সংগ্রহে আরবী ও ফরাসী কিতাবপত্র ছিল। সেগুলো প্রায় সবগুলোই কয়েকবার করে পড়া।

.

স্কুলে চাকরি করতে করতে মাথায় অদ্ভুত খেয়াল চাপলো। সাহস করে বড় আপার কাছে পাড়লাম।

-আমি আবার পড়তে চাই!

-এভাবে! এই বয়েসে?

-জি।

আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে আবেদন করলাম। আশ্বাস দিলাম কাজে কোনও ঘাটতি হবে না। মিটিং ডাকা হলো। সবাই খুশি মনেই সম্মতি দিলেন। শুরু

হলো আরেক জীবন। স্কুলের চাকুরি, নিজের ক্লাস-পড়াশুনা, ছেলেদের দেখাশুনা। বড় ছেলের হেফযের তদারকি! দম ফেলার ফুরসত ছিল না। কোন ফাঁকে সময় ফুড়ুৎ করে চলে যেত টেরও পেতাম না। মনে হতো এতদিন পর জীবনের মতো একটা জীবন কাটাতে শুরু করেছি।

ছেলের পড়া তদারক করতে করতে আমিও কোন ফাঁকে হাফেয হয়ে গেলাম টেরও পাইনি। আসলে স্বামীর সংসারে থাকা পাঁচ বছরের একটানা তেলাওয়াতের কারণেই কুরআন কারীম অনেকটা আমার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। স্বামী যদি নেশার পাল্লায় না পড়তেন তাহলে আরও ভাল হতো। প্রথম প্রথম বিয়েটাকে আমার জন্যে অভিশাপ মনে করতাম। পরের দিকে দেখেছি কষ্ট হয়েছে সত্য। আবার সংগ্রামের শক্তিও যুগিয়েছে বিয়েটা। অনেক কিতাব পড়ারও সুযোগ করে দিয়েছিল। কুরআনের তাফসীর পড়ার তাওফীক হয়েছিল। অবাক হয়ে ভাবি, যে মানুষ এক সময় পড়াশুনা নিয়ে ছিল সে মানুষ টাকার পাল্লায় পড়ে এমন বদলে যায় কিভাবে? আবার এও ভেবেছি, বইগুলো হয়তো তার নয়; অন্য কারো! জিজ্ঞেস করে জানার উপায় ছিল! সুন্দর করে কথা বলা যেত? যা খিটখিটে! তবে মানুষটার একটা গুণ ছিল, বইপত্র পড়তে দেখলে কিছু বলতো না।

আমার মাধ্যমিক পড়া শেষ হলো। এদিকে বড় ছেলেটা হাফেয হয়ে গেলো। ছোট ছেলের হেফযও অনেকদূর! এখন বড়মিয়ার পড়াশুনা! কোনও কূলকিনারা করে উঠতে পারছিলাম না। আল্লাহর কাছে ফায়সালা চেয়ে দু'আ করে যাচ্ছিলাম।

ছেলেকে পড়াতে হলে বড় শহরে যেতে হবে। পরামর্শ করলাম। নগদ টাকা দরকার। সাহস করে স্বামীর ভিটে বিক্রি করে দিলাম। শুধু জাফরানের ক্ষেতগুলো রেখে দিলাম। পরে কাজে লাগবে। ভাইদেরকে দায়িত্ব দিলাম সেগুলো দেখভাল করার। স্কুলের বেতন থেকে কিছু টাকা জমেছিল। সেগুলো আর ভিটে বিক্রির টাকা সাথে নিয়ে, এক ভাই আর তিন সন্তান নিয়ে শহরে পাড়ি জমালাম। আগেই বাসা ঠিক করা ছিল। স্কুলের বড় আপার এক বান্ধবী থাকেন শহরের এক কলেজে। অধ্যাপিকা। ছেলেদেরকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে একদিন ভাইকে নিয়ে বড় আপার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গেলাম। মনের সুপ্ত ইচ্ছা খুলে বললাম। তিনি বেশ মুগ্ধ হলেন। তার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। আগ বেড়ে বললেন,

-তুমি চাইলে শহরের এক কুরআনি মাদরাসার মেয়েদের পড়ানোর দায়িত্বও নিতে পারো! সরকারি চাকুরি!

-আমি রাজি আপু!

ভাইকে আমার সাথেই রেখে দিলাম। সে মাঝেমধ্যে গ্রামে গিয়ে আবার ফিরে আসতো। তার সবকিছু আমিই দেখাশুনার ভার নিলাম। তার মূল কাজ ছিল ভাগ্নেদের তদারক করা। ঘরসংসার দেখা। গ্রামের জাফরানের চাষাবাদের খোঁজখবর করা। অন্যভাইদের থেকে হিশেবপত্র বুঝে আনা। তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া।

বাপ-ভাই থেকে জাফরানের আয় ভালো করে উশুল করতে না পারলেও, যা আসতো তার পরিমাণ কম ছিল না। বলতে গেলে আমাদের খরচ উঠে আরও উদ্বৃত্ত থাকতো। টাকা জমাচ্ছিলাম কয়েকটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে,

ক. আমার গরীব বাবা-মা সহ নিজে একবার হজ করা।

খ. ছেলেদেরকে বাইরে পড়তে পাঠানো।

গ. আমার জন্মভূমি তালাভীনে মেয়েদের জন্যে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা।

ঘ. আমাদের এলাকার চারপাশ পাহাড়বেষ্টিত। তার মধ্যে জাফরান ক্ষেত। ভাল হাসপাতাল নেই। গরীব ক্ষুদে জাফরান চাষীরা জমিতে পানি দিতে পারে না। বিত্তশালী জাফরান চাষীদের হাতে গরীবরা জিম্মি হয়ে থাকে! এজন্য সবার জন্যে উন্মুক্ত একটা সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আমার পড়াশুনা কলেজপর্ব শেষ হয়ে ভার্সিটিতে পৌঁছল। ঘরে একা একা বসে না থেকে পড়াশুনা করাই তো ভাল। কুরআনি মাদরাসায় বেশি সময় দিতে হয় না। তারপর তো অফুরন্ত অবসর। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া নিয়ে ছোট্ট একটা বাধা এসেছিল। একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। আমিও প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পাত্রপক্ষ কিছু বেয়াড়া শর্ত জুড়ে দেয়ায় সেটা আর সম্ভব হলো না। এবার কোনরকম বাধা ছাড়াই ভার্সিটির পর্ব শেষ হলো। বয়েস তখন সাঁইত্রিশ। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম গ্রামের জাফরান চাষের উন্নতির জন্যে কিছু করবো। শিক্ষকের পরামর্শে ডক্টরেট থিসিসের বিষয়ও নিলাম,

= জাফরানের প্রকারভেদ ও চাষাবাদ পদ্ধতি!

বড় দুই ছেলে কায়রাওয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করছে। ওখানের পাট চুকলে বাইরে যাবে। ছোটটার পড়াশুনাও চলছে। সবকিছু গুছিয়ে গ্রামে চলে এলাম। জমানো টাকা দিয়ে প্রথমেই সেচের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিলাম ভাইদেরকে। দশ-দশটা ভাই থাকায় লোকবলের অভাব হলো না। তারাও আমাকে শুধু বড়বোনই নয়, আরও বেশি কিছু মনে করে।

বাবাকে হজের কথা বলায় অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেননি। আম্মা তো হজের কথা শুনে কেঁদেই দিলেন। বারবার অতীতের আচরণের জন্যে মাফ চাইতে লাগলেন। একটা কথাই আমি বুঝেছি এই জীবনে,

= আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

আল্লাহ আমার জীবনের কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেননি। ইনশাআল্লাহ বাকীগুলোও রাখবেন না। আমার শৈশবের কুরআনি মাদরাসার দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম। মেয়েদের স্কুলটার দায়িত্বও। জাফরানের সেচপ্রকল্পটা ভাইদের হাতে ছেড়ে দিলাম। আর হাসপাতালের দায়িত্বটা রইল। ছোট ছেলেটা ডাক্তার হচ্ছে, সেই এটা দেখাশুনা করবে।

বাকী জীবন আমার গ্রামের শিশু-কিশোরদের সেবা-শিক্ষা ও অসহায় জাফরান শ্রমিকদের উন্নতির পেছনে মেহনত করে কাটিয়ে দিবো। ইনশাআল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৫১১

অদৃশ্য কবিতা!

নতুন শিক্ষক এলেন। ছাত্রদের অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে একজন একজন করে পড়া ধরলেন। পালাক্রমে শেষ বেঞ্চিতে এলেন। একটা ছেলে বসে আছে। চেহারায় কিছুটা ভয়, কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা লজ্জা-সংকোচ! সবার মতো তাকেও একটা পড়া জিজ্ঞেস করলেন। সবাই হেসে উঠলো। শিক্ষক তো অবাক, ছাত্ররা হাসলো কেন? পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন বিষয়টা। তিনি একজন পড়া জিজ্ঞেস করেছেন একজন 'বোকা' ছাত্রকে।

স্কুল ছুটির পর শিক্ষক সবার কাছে বোকা বলে পরিচিত ছাত্রটাকে ডেকে পাঠালেন। খোঁজ-খবর নিলেন। জানতে পারলেন, আগের শিক্ষকরা কোনদিন তার পড়া ধরেননি। নতুন কেউ ধরলে হঠাৎ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জানা পড়াও শোনাতে পারেনি। আস্তে আস্তে সবাই ধরে নিয়েছে, সে একজন আস্ত বোকা! সে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, আসলেই সে একজন নিরেট

বোকা! তাকে দিয়ে আর যাই হোক, লেখাপড়া হবে না।

শিক্ষক একটু চিন্তা করে বললেন,

-আমি তোমাকে আজ একটা কবিতার দু'টো লাইন লিখে দিচ্ছি! নিজের নাম যেভাবে মুখস্থ করো, লাইনদুটোও সেভাবে মুখস্থ করে আসবে! বিষয়টা কাউকে জানাবে না। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। আমি আর তুমি।

পরদিন ব্যাকরণের ক্লাসে শিক্ষক এলেন। কবিতার দুইটা লাইন লিখলেন বোর্ডে। এরপর কবিতার অলংকার-ছন্দ ইত্যাদি বোঝালেন। এক পর্যায়ে লাইন দুটো মুছে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর আচানক প্রশ্ন করলেন:

-বোর্ডে লেখা কবিতার লাইনদুটো কে মুখস্থ বলতে পারবে? হাত তোল!

সবাই বসে রইল। কবিতাটা মুখস্থ করার কথা কারো মাথায় ছিল না। পেছনের সারি থেকে একজন হাত তুলল। অন্যরা অবাক! বোকা ছেলেটা কিভাবে এত সাত তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে ফেললো? শিক্ষক ছাত্রটিকে কবিতা শোনাতে বললেন। লজ্জা-জড়তামাখা স্বরে ছেলেটা আবৃত্তি করে শোনাল। শিক্ষক ছাত্রটার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

হুবহু একই ঘটনা পরের কিছুদিন আরও কয়েকবার ঘটলো। নানা প্রসঙ্গে। নানা আঙ্গিকে। ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে। ছাত্র তো বটেই অন্য শিক্ষকদের কাছেও বিষয়টা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। ভুক্তভোগী ছাত্রটারও নিজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাচ্ছিল। আগে সে পড়া পারবে না বলে পড়তো না। যেভাবে স্কুল থেকে ফিরে বইপত্র টেবিলের ওপর রাখতো, ঠিক সেভাবেই পরদিন স্কুলে নিয়ে আসতো। বইপত্র ছুঁয়েও দেখতো না। পড়া না পারলে কে পড়বে?

সঙ্গী-সাথীরা এখন আর তাকে অবহেলা তো করেই না, উল্টো সমীহ করতে শুরু করেছে। সবাই ধরাধরি করে জোর করে সামনের বেঞ্চিতে এনে বসাল। অন্য শিক্ষকরাও এখন তার কাছে পড়া জিজ্ঞেস করে। সেও গড়গড় করে পড়া বলে দিতে পারে। তার মনে ক্ষীণ একটা ধারণা ছিল,

-আমি বোধ হয় ওই স্যারের পড়াই পারবো, কারণ তিনি আগে থেকেই কী জিজ্ঞেস করবেন জানতে পারি। অন্য শিক্ষকদের পড়া পারবো না। তার চিন্তা ভুল প্রমাণিত হলো। অজান্তেই সে আবিষ্কার করলো, অন্য শিক্ষকদের পড়াও সে পারে।

বিপুল উদ্যমে পড়া শুরু করে দিল। প্রতিদিনের পড়া ভালোভাবে শেখার পাশাপাশি আগের না পড়া পাঠগুলোও আয়ত্ত করতে শুরু করে দিল। সেই প্রিয় স্যারের পরামর্শ মেনে সুনির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে অধ্যবসায় শুরু করলো। বছর শেষে দেখা গেলো পরীক্ষার ফলাফলে মেধাতালিকায় সেরাদের তালিকায় তার নামও উঠে এসেছে।

মানুষ দুই প্রকার।

ক) এরা কল্যাণের চাবিকাঠি। অকল্যাণের যম। নিজেও উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর থাকে। অন্যকেও উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে যায়।

খ) এরা অকল্যাণের চাবিকাঠি। কল্যাণের যম। উদ্যমহীন। উৎসাহশূন্য। নিরাশ। হতাশ। একটু বাধা এলেই থমকে যায়। ঝিম ধরে থাকে। তাদের মুখে অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি লেগেই থাকে। নিজে তো কিছু করে না, অন্যকেও করতে দেয় না।

আমাদের উক্ত ছাত্রটি দ্বিতীয় প্রকার মানুষের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সে নিজেই দ্বিতীয় প্রকারে পরিণত হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তাদের স্কুলে একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক আসেন। তার জাদুস্পর্শে দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়ে যাওয়া ছাত্রটা প্রথম দলে চলে আসতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিটি শিক্ষক বা বাবা-মা চাইলেই নিজেরা প্রথম প্রকার হতে পারেন। নিজের ছাত্র ও সন্তানকেও প্রথম প্রকারের ছাঁচে গড়ে তুলতে পারেন।

জীবন জাগার গল্প : ৫১২

দৃষ্টিসংযম!

সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ.। বিশিষ্ট তাবেয়ী। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রা.)-এর আযাদকৃত দাস। মদীনার সাতজন বিশিষ্ট ফকীহের একজন। দেখতে শুনতে ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর। তাকওয়া পরহেজগারীতে তুলনারহিত! হবেন না কেন, নবী পরিবারের আলো বাতাস গায়ে মেখেছেন যে!

একবার সফরে বের হলেন। একজন সাথীকে নিয়ে। খাবারের প্রয়োজন দেখা দিল। সাথী খাবার আনতে বাজারে গেলেন। সুলাইমান এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করছেন।

অদূরে এক উঁচু টিলার ওপরে এক বেদুঈন যুবতী বসা ছিল। তার চোখ পড়লো সুলাইমানের ওপর। এত সুন্দর পুরুষ সে তার জীবনে দেখেনি। বিস্ময়ে তার দুই চোখ স্থির হয়ে গেলো। বোরকা-নেকাব পড়া থাকলেও, সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। কিসের যেন এক মোহিনী টানে এদিকে রওয়ানা দিল। টিলা থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়েও তার সম্বিত ফিরল না। ঘোর কাটল না।

সামনে এসে দাঁড়াল। নেকাব উঠিয়ে ফেলল। বেরিয়ে এল পূর্ণচন্দ্রের মতো অনিন্দ্য সুন্দর এক মুখচ্ছবি!

-আমাকে কিছু দিন!

সুলাইমান একবার তাকিয়েই দৃষ্টি অবনত করে ফেললেন। তিনি মনে করেছেন মেয়েটা কিছু চাইতে এসেছে। ক্ষুধার্ত। তিনি উঠে ব্যাগ খুলে সামান্য যে খাবার ছিল, সেটা বাড়িয়ে দিলেন।

-আমি এই খাবার দিয়ে কী করবো!

-তাহলে কী চাও?

-একজন পুরুষের কাছে একজন নারী কী চাইতে পারে?

সুলাইমানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। ভয়ে কেঁপে উঠলেন। বললেন,

-তোমাকে এখানে খোদ শয়তান পাঠিয়েছে।

সুলাইমান দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। বসে পড়ে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

মেয়েটা এহেন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি দেখে নেকাব নামিয়ে ফেলল। নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো। কিছুক্ষণ পর সাথী ফিরল। বাজার সদাই করে। খাবার-দাবার নিয়ে। দেখলো সুলাইমানের চোখে কান্নার ছাপ।

-তুমি কেঁদেছ? কিন্তু কেন?

-না, তেমন কিছু নয়।

-বড় কিছু না হয়ে যায় না। আমি তোমাকে সেই ছেলেবেলা থেকেই চিনি। বড়সড় কিছু না হলে তুমি কাঁদার পাত্র নও!

সঙ্গীর পীড়াপীড়িতে সুলাইমান ঘটনা খুলে বলতে বাধ্য হলেন। পুরো ঘটনা শুনে সাথী হাতের ব্যাগ-থলে রেখে নিজেই কাঁদতে শুরু করে দিল।

-অবাক কাণ্ড! তুমি কাঁদছ কেন?

-কাঁদব না! তোমার চেয়েও আমার বেশি কাঁদা প্রয়োজন।

-কেন?

-আমি আজ তোমার স্থানে থাকলে সে মেয়ের প্রস্তাব এড়াতে পারতাম না। নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। ঠিকই গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়তাম!

আবার সফর শুরু হলো। মক্কায় পৌঁছলেন দু'জনে। তাওয়াফ-সাঈ শেষ হলো। হাজরে আসওয়াদের কাছে বিশ্রাম করতে বসলেন। একটু তন্দ্রামতো এলো। সে অবস্থাতেই স্বপ্নে দেখলেন, একজন অতুলনীয় সুন্দর মানুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অপার্থিব একটা সুবাস তার শরীর থেকে ভেসে আসছে।

-আপনি কে?

-আমি ইউসুফ বিন ইয়াকুব!

-ওহ! যুলায়খার সাথে সে ঘটনায় আপনি বিস্ময়কর তাকওয়ার পরিচয় দিয়েছেন!

-তোমার আর সেই বেদুঈন যুবতীর ঘটনাও কিন্তু কম বিস্ময়কর নয়!

জীবন জাগার গল্প : ৫১৩

সদকার কাঁটা!

আশেপাশে যে কয়টা বাড়ি আছে, সবাই তাকে বেশ সম্মান করে। বয়েসও হয়েছে অনেক। আশি ছুঁই ছুঁই। পরহেজগার আর ইবাদতগুজার মুরুব্বী হিশেবে পরিচিত তিনি। স্বামীর বাড়িতে এসেছেন অবধি সবাই তাকে এক নামে চেনে। পর্দানশীন হলেও পাড়া-পড়শীর বউ-ঝিদের কারণে পুরুষরাও তার গুণপনার কথা জেনে গিয়েছিল। বিপদে-আপদে তার কাছেই সবাই সাহায্য-পরামর্শ চাইতে আসে।

একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, পাশের বাড়ির কর্তাকে ভয়াল এক সাপ দংশন করেছে। ব্যথায় ছটফট করতে করতে তিনি মারা যাচ্ছেন। ঘুম ভেঙে গেলো। তার মনে হলো স্বপ্নটা অমূলক নয়। এটা একটা ইঙ্গিত। মানুষটাকে সতর্ক করা দরকার।

সকালে ফজর নামায পড়েই খবর পাঠালেন,

-আমি তোমার সম্পর্কে একটা স্বপ্ন দেখেছি। তোমাকে একটা বিষধর সাপ দংশন করেছে। তুমি ব্যথায় নীল হয়ে গেছো।

-দাদীমা! অন্য কেউ দেখলে আমি গুরুত্ব দিতাম না। আপনার স্বপ্নের একটা গুরুত্ব আছে। সত্য মিথ্যা যাই হোক। আমি এখন কী করতে পারি?

-আমি বলি কী কিছু একটা সদকা করো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস আছে, সদকা বান্দাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচায়। অপঘাতে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

-তাহলে আমাকে সদকা করার পরামর্শ দিচ্ছেন?

-জি। তাই করো ভাই। স্বপ্নটা সত্যি হলে সদকা কাজে দিবে। মিথ্যা হলেও সমস্যা নেই। সওয়াব হবে। ভবিষ্যতে বিপদের আগাম রক্ষাকবচ হিশেবেও কাজ করবে।

বাড়িতে একটা পোষা ছাগল ছিল। বেশ বড় সড়। সামনের কুরবানীতে জবেহ করার খেয়াল ছিল মনে মনে। সেটাই সদকা করে দেয়া হলো। নিজেই উদ্যোগী হয়ে যবেহ করাল। গোশত বানাল। তিনভাগ করে একভাগ সদকার নিয়তে দান করে দিল। দ্বিতীয় ভাগ আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দিল। তৃতীয় ভাগ রান্না করে পাড়ার কিছু পরহেজগার নামাযীকে দাওয়াত করলো।

কী ভেবে রানের একটা অংশ ফ্রিজে রেখে দিল। পরে খাওয়া যাবে। মেহমানরা এলেন। সবাই বেশ তৃপ্তিভরে খেলো। দু'আ করলো। বাড়ির কর্তা মনে দুশ্চিন্তা। যতই স্বাভাবিক থাকতে চাচ্ছেন পেরে উঠছেন না। এমনিতেই সাপখোপের প্রতি বেজায় ভয়। যদি রাতের আঁধারে সাপ এসে পড়ে!

মেহমানরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বাড়ির কর্তা সবার পীড়াপীড়িতে সামান্য একটু খাবার নাকেমুখে গুঁজলেন। ভেতরে যাচ্ছে না। তবুও মুখ রক্ষার্থে! ঘর খালি হতেই মনে হলো,

-ওহহো! দাদীমার বাড়িতে তো কিছু পাঠানো হয়নি!

সাথে সাথে ধড়মড় করে উঠে ফ্রিজ খুললেন। বাকি থাকা কাঁচা গোশত, এবং কিছু রান্না করা গোশত নিয়ে ছুটলেন। গোশত পেয়ে দাদীমা ভীষণ খুশি হলেন। আগ্রহভরে খেলেন। ঘরের আপন নাতবৌকে ডেকে কাঁচা গোশতও তাজাদম রান্না করে ফেলতে বললেন। নাতিরা বাজার থেকে ফিরলে খাবে।

মনে শংকা আর অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলো মানুষটা। সকাল বেলা ফজরের সময়ই সদর দরজায় দিক থেকে হৈ চৈ ভেসে এলো। ঘটনা কী দেখার জন্যে দৌড়ে গেলো। একটা সাপ সীমাহীন আক্রোশে তড়পাচ্ছে।

নামাযে যাওয়ার সময় এক মুসল্লি সাপের এমন অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল। লাঠি এনে সাপটাকে মারা হলো। সাপের গলায় একটা 'হাড়' আটকে ছিল। গিলতে পারছিল না। ধারালো হাড়ের চোখা আগা মুখে গেঁথে গিয়েছিল। পরে জানা গেল, দাদীমাদের বাড়িতে হাদিয়ার গোশত রাতেই রান্না করা হয়েছিল। সবার খাওয়া শেষ হলে 'ঝুটা হাড়' বাড়ির উঠোনের এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল। বোঝা গেলো সেখান থেকেই সাপটা হাড় গিয়েছিল। পরে তড়পাতে তড়পাতে রাস্তার দিকে গিয়েছে!

জীবন জাগার গল্প : ৫১৪

অলসতম মানুষ!

আবদুল্লাহ মাগলুস। একটি আরবীভাষী বড় দেশের এথলেট। সৌখিন সাইক্লিস্ট। তিনি লন্ডন ম্যারাথন থেকে ফিরে এসে এক সাক্ষাৎকারে বললেন:

-আমরা দেশ থেকে তিনজন সাইকেল ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলাম। নিজের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল বেশ উঁচু! আমরা আসলে পেশাদার সাইকেল চালক ছিলাম না। ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি যুবকরা বেশ উদ্দীপনার সাথে সাইকেল চালাচ্ছে। তাদের নিজস্ব ক্লাবও আছে। আমাদেরও শখ জাগলো এমন কিছু করার। দেশে ফিরেই তিনজনে একটা ক্লাব গঠন করে ফেললাম। শুরু হলো সাইকেল নিয়ে বের হওয়া। পত্রিকায় ম্যারাথনের সংবাদ দেখে ইচ্ছা হলো, আমরাও তো চাইলে অংশ নিতে পারি। জায়গামতো যোগাযোগ করলাম। কাজ হয়ে গেলো। শুধু অফিসের সামনে একটু সাইকেল চালিয়ে দেখাতে হলো। ব্যস! পাশ।

রেস শুরুর আগে সারা বিশ্ব থেকে আসা খেলোয়াড়দের দেখে আমাদের করুণাই জাগতে শুরু করেছিল। শরীরে-স্বাস্থ্যে তারা বেশ দুর্বল। বেশ কয়েকজন বুড়োকেও দেখলাম বুক চিতিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমরা তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করছিলাম।

-বুড়োগুলোর এই বয়সে এসে ভীমরতি ধরেছে!

নির্ধারিত সময়ে রেস শুরু হলো। প্রথম দিকে বেশ ভালোই চালালাম। আমরা মরুভূমিতে যেভাবে চালাই আরকি! তীব্র গতিতে সাইকেল চালিয়ে আমরা তিনজন সাঁ সাঁ করে সবার আগে বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর পেছনে তাকিয়ে দেখি সবাই কত্তো পেছনে! চলতে চলতে বেশ অনেকক্ষণ চললো। গতি কমে আসছিল। পা আর চলছিল না। মনে হচ্ছিল সাইকেল রেখে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ি! হলও তাই। দুই ঘন্টা চালানোর পর একে একে দুইজন নেতিয়ে চলন্ত সাইকেল থেকে ধপাস করে পড়ে গেলো। আরেকজন শুধু আরো পনের মিনিট বেশি চালাতে পারলো।

একটু পরেই দেখি, সবাই আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদেরকে দেখে মনে হলো, তারা যেন এইমাত্র নামলো। আরও অবাক হওয়ার পালা, যখন বুড়োগুলোকে দেখলাম। তারাও ধীরস্থির গতিতে সামনে বাড়ছে! লজ্জায় মুখ লুকানো ছাড়া কোনও উপায় রইল না।

গাড়ি এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এলো। আমরা লাশের মতো শুয়ে শুয়ে হোটেলে ফিরলাম। শরীরটা দুর্বল লাগলেও শরমে যেন মরে যাচ্ছিলাম। আমরা দুই ঘন্টা চালিয়েই নেতিয়ে পড়েছি, একথা যেই শুনছে সেই পরম কৌতুকভরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল করুণা! অবজ্ঞা! ভর্ৎসনা!

আমাদের ভেন্যু পরিবর্তন হলো। পরদিন ভিন্ন এক ভবনে থাকতে গেলাম। আরও বিভিন্ন ইভেন্টের এথলেটরাও এখানে থাকে। গিয়ে দেখি লিফট নষ্ট। একজন হৈ চৈ শুরু করে দিল। একজন নিরাপত্তা রক্ষী দৌড়ে এলো।

-কোনও সমস্যা?

-এত বড় একটা বিল্ডিং, আপনাদের লিফট কোথায়?

-স্যার, আমরা লিফট ঠিক করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি! অবশ্য আপনারাই প্রথম অভিযোগ ঠুকলেন!

-কেন এই ভবনে আরো অসংখ্য খেলোয়াড় আছে, তারা কিভাবে ওঠানামা করছে?

-তারা সবাই সিঁড়িপথই ব্যবহার করছে। বেশ আনন্দের সাথেই! লিফট থাকলেও তারা ব্যবহার করতো কি না সন্দেহ!

রক্ষীর কথা শুনে আমরা আরো অধোবদন হয়ে গেলাম। চুপচাপ সিঁড়ির পথ ধরলাম। ঝামেলা বাঁধলো রাতে। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পুরো ভবনের সবাইকে ফিরে আসার নিয়ম। আমরা তিনজন ভেবে এসেছিলাম,

ইউরোপে যাচ্ছি, নানা 'সুযোগ' ও 'সুবিধা' ভোগ করে যেতে পারবো! সে আশার গুঁড়ে বালি! কোনও আনন্দের ব্যবস্থাই নেই! দুয়েকজন নারী খেলোয়াড়ের সাথে ভাব জমাতে চেষ্টা করলাম। পাত্তাই পেলাম না।

আমাদের তিনজনের একজন মদে মত্ত হয়ে চেকোশ্লাভিয়ার এক স্বর্ণকেশী মহিলা এথলেটকেই হামলা করে বসলো। পুলিশ জেলে না পুরলেও এহেন আচরণে পুরো কমপ্লেক্সেই টি টি পড়ে গেলো। আরও কিছু উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে টুর্নামেন্টের মাঝামাঝিতে একবার ডেকে নিয়ে সতর্ক করে দেয়া হলো। তাতেও আমাদের সুমতি ফিরল না। বরং আগুনে আরও ঘি ঢালা হলো যেন!

কর্তৃপক্ষ আমাদের তিনজনকে নিয়ে বসলেন। বোর্ডে আমাদের দেশীয় একজন কর্মকর্তাকেও রাখলেন। কথা বলতে সুবিধা হওয়ার জন্য। দীর্ঘসময় ধরে কথাবার্তা হলো। চূড়ান্ত ভূমিকা টানা হলো এই বলে,

-বিশেষ কারণবশতঃ তোমাদেরকে বহিষ্কার করা যাচ্ছে না। কিন্তু তোমাদেরকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিতে চাই! এভাবে বারবার তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকলে, আমরা অপারগ হয়ে পড়বো। তোমরা একটা মুসলিম দেশ থেকে এসেছ। তোমাদের কারণে সবাই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে। তোমাদের দেশ একটি ধর্মভীরু রাষ্ট্র হিশেবেও অনেকের কাছে পরিচিত! তোমাদের বিরুদ্ধে একজন রুশ ব্যালেরিনা অভিযোগ করতে গিয়ে এও বলেছে, তোমরা আদৌ সে দেশের কি না, মুসলিম কি না সেটা খতিয়ে দেখা দরকার!

এরপর আমরা রীতিমতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। পুরো বৈঠকে মাথা তুলতে পারিনি। প্রথম দিকে উদ্ধতভাব থাকলেও যতই সময় গড়াচ্ছিল আর অভিযোগগুলো একটার পর একটা পড়া হচ্ছিল, মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম।

যথসময়ে দেশে ফিরে এলাম। কেমন যেন একটা অবসাদ আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অতীত জীবনটাকে ফাঁকা আর ফাঁপা মনে হতে লাগল। তিনজন মিলে ঠিক করলাম ওমরা করবো। তারপর নিজেদের জীবনকে নতুন করে শুরু করবো। তখন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি, ভালো কিছু করতে। নিজেদেরকে শোধরাতে! অন্যদেরকেও দ্বীনের দিকে ডাকতে! আমাদের মতো যারা ভুলের মধ্যে আছে, তাদের সামনে দ্বীনের সঠিক চিত্রটা তুলে ধরতে!

জীবন জাগার গল্প : ৫১৫

মুনাযির!

আব্বাসী যুগ থেকেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল দুই পক্ষের 'মুনাযারা' বা বিতর্ক করার প্রথা। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-ও অনেক বড় মুনাযির বা বিতার্কিক ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মুনাযারা তো ইসলামের অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ওলামায়ে দেওবন্দের শুরুর দিকের বড়রা প্রায় সবাই জবরদস্ত বিতার্কিক ছিলেন। কাসেম নানুতুবী (রহ.) শিয়া-হিন্দু সবার সাথেই বিতর্ক করেছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর বিশিষ্ট মুরীদ আল্লামা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (রহ.) তো খ্রিস্টানদের কাছে ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। তার ইযহারে হক কিতাব খ্রিস্টানদের কাছে সাক্ষাত 'বাঘ'।

আবু বকর বাকিল্লানী (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী আলিম। আরবী অলংকার শাস্ত্রে তার অবস্থান অনস্বীকার্য। ইলমুল কালাম ও ইলমুল মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)-এ তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ৩৭১ হিজরীতে তাকে ইরাক থেকে পাঠানো হলো কনস্টান্টিনোপলে। খ্রিস্টানদের সাথে মুনাযারা করার জন্যে।

খ্রিস্টান সম্রাট আল্লামা বাকিল্লানীর আগমনের কথা জানতে পেরে, হুকুম দিলেন প্রবেশ পথটা যেন খুবই নিচু করে বানানো হয়। ইমাম বাকিল্লানী দেখেই চালাকিটা ধরে ফেলতে পারলেন। বুদ্ধি খাটিয়ে মাথা নিচু না করে পেছনের দিকটা রাজার দিকে ফিরিয়ে উল্টো হয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। রাজা টের পেয়ে গেলেন আজ তারা এক শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছেন। ইমাম সাহেব দরবারে প্রবেশ করে কাউকে সালাম দিলেন না। শুধু হালকা সম্ভাষণ জানিয়ে দায় সারলেন। ভূমিকা ছাড়াই প্রধান যাজকের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন,

-কী কেমন আছেন? বউ-বাচ্চা কেমন আছে?

মাওলানার এহেন প্রশ্নে রাজা রীতিমতো চটে গেলেন,

-তুমি জানো না আমাদের ধর্মযাজকরা তোমাদের মতো বিয়ে করেন না! তাদের বাচ্চাকাচ্চাও হয় না!

-আল্লাহু আকবার! তাই নাকি! আপনারা যাজকদেরকে বিয়ে থেকে বাঁচিয়ে রাখেন অথচ আপনাদের রবকে শুধু বিয়ে করিয়েই ক্ষান্ত হননি! আস্ত একটা সন্তানও বের করে দেখিয়েছেন!

রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,

-বেশ তো বড় বড় কথা বলছ! তোমাদের নবীর স্ত্রী আয়েশা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখো?

-কেন রাখব না। আম্মাজান (রা.)-এর প্রতি ওটা ছিল মিথ্যা অপবাদ। মুনাফিকরা ওটা প্রচার করেছে। বর্তমানে রাফেযীরা সেটাকে জিইয়ে রেখেছে। আপনাদের কাছেও মিথ্যা সংবাদটা পৌঁছিয়েছে।

-ঘর বাঁচাতে তোমরা তো এমনটা বলবেই!

-এমন ঘটনা আপনাদের ঘরেও ঘটেছে!

-কোনটা?

-সে খবরও নেই! মারয়াম (আ.)-কে ইহুদিরা (নাউযুবিল্লাহ) ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়নি?

-তা দিয়েছে! ওটা দুষ্ট ইহুদিদের জঘন্য মিথ্যাচার!

-আমাদের ঘরেরটাও তেমনি ঘটনা! আয়েশা (রা.)-এর তো বিয়ে হয়েছে। সন্তান হয়নি। মারয়াম (আ.)-এর বিয়ে হয়নি কিন্তু সন্তান হয়েছে। উভয়েই পবিত্র। তর্কের খাতিরে আপনার কথা ধরলে, কে বেশি অপবাদের উপযুক্ত?

রাজা না পেরে আরও রেগে গেলো।

-তোমাদের নবী তো যুদ্ধ করতেন!

-জি।

-নিজে স্বয়ং ময়দানে থাকতেন?

-থাকতেন।

-যুদ্ধ তো করতেন, জিততেন?

-অবশ্যই!

-কখনো হারেননি?

-একবার! কৌশলগতভাবে!

-আশ্চর্য! আল্লাহর নবীও হারে!

-অবাক কাণ্ড! খোদাকেও শূলে চড়িয়ে মারা যায়?

জীবন জাগার গল্প : ৫১৬

আলেম তো এমনই!

আবদুল্লাহ বিন আলী। আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মূল যোদ্ধাদের একজন। অসম সাহসী বীর। চল্লিশ হাজারের মতো মানুষ তার হাতে মারা পড়েছে। উমাইয়া খেলাফতকে নির্মূল করতে গিয়ে আব্বাসী আন্দোলনের প্রবক্তারা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে খুব কমই আছে। যেখানেই উমাইয়া বংশীয় কাউকে পেয়েছে, হত্যা করেছে।

আবদুল্লাহ বিন আলী দিমাশকে প্রবেশ করলো বিজয়ীর বেশে। বেপরওয়া হয়ে প্রশ্ন করলো,

-আজ কেউ আমার মুখের ওপর কথা বলার মতো আছে এই শহরে?

-আপনার শত্রুদের কেউ বাকী নেই! কেউ আপনার দিকে চোখ তুলে কথা বলার সাহস পাবে না। তবে ইমাম আওযায়ীর কথা ভিন্ন!

-তাকে এখুনি আমার সামনে হাজির করো!

সাথে সাথে লোক ছুটলো ইমাম সাহেবকে ধরে আনতে। তিনি সংবাদ পেয়ে গোসল সেরে নিলেন। কাফন পরলেন। তার ওপর নিত্যদিনের পোষাক পরলেন। লাঠিটা হাতে নিয়ে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

আবদুল্লাহ বিন আলী বড় কর্মকর্তাদের আদেশ দিল, তোমরা দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাও। মারমুখো ভঙ্গিতে তরবারি উঁচিয়ে রাখো। যাতে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে!

ইমাম সাহেব নির্ভিকচিত্তে মাথা উঁচিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। দু'পাশের কৃত্রিম ভীতিকর দৃশ্য আল্লাহভীরু ইমামের মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারলো না। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে হেঁটে গেলেন।

-তুমিই আওযায়ী?

-লোকে তাই বলেই ডাকে আমাকে!

ইমাম সাহেব পরে বলেছিলেন,

-আমি তার দরবারে প্রবেশ করার আগেই নিজের প্রাণকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। কল্পনার চোখে ভাসছিল কিয়ামতের দিনের দৃশ্য। আল্লাহ তা'আলা তার আরশে সমাসীন। একদলকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া

হচ্ছে। আরেকদলকে জাহান্নামে। এমন দৃশ্যের সামনে দুনিয়ার জালেমকে আমার কাছে একটা মাছির মতোও মনে হয়নি! ভয় পাওয়া তো দূরের কথা!

-এই যে যুদ্ধে এত রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটলো, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

-আপনার দাদাজান আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন,

-নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন কারণ ছাড়া একজন মুসলমানের রক্ত কিছুতেই হালাল হতে পারে না!

হাদীসটা শেষ করার আগেই আবদুল্লাহ সীমাহীন রেগে গেলো। তার অবস্থা দেখে, ইমাম আওযায়ী (রহ.) গর্দান থেকে পাগড়ী তুলে তরবারির কোপ খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। উপস্থিত কর্মকর্তারাও রক্তের ছিটা থেকে বাঁচার জন্যে যার যার পরিধেয় সামলে নিল।

আবদুল্লাহ প্রচণ্ড ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আবার প্রশ্ন করলো,

-আমি যে সম্পদ অর্জন করেছি বা যেসব ঘরবাড়ি দখল করেছি, সেসব সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

-আল্লাহ কেয়ামতের দিন আপনাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমনটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিলেন। সম্পদগুলো হালাল হলে হিসাব নেয়া হবে। হারাম হলে ইকাব (শাস্তি) দেয়া হবে।

আবদুল্লাহর রাগ আরও বেড়ে গেলো। সবাই বুঝে গেলো চূড়ান্ত ও চরম কোনও সিদ্ধান্ত এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইমাম সাহেব তখন বিড়বিড় করে পড়ছেন,

= হাসবিয়াল্লাহু...... আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই। আমি তার উপরই তাওয়াক্কুল করছি। তিনি মহান আরশের অধিপতি।

একটু পরে আবদুল্লাহ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই বললো:

-ঠিক আছে আপনি চলে যান!

ইমাম সাহেবকে বড় অংকের টাকা দিলেন। ইমাম সাহেব সেটা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। উপস্থিত এক কর্মকর্তা টাকাটা গ্রহণ করতে বললো। ইমাম সাহেব থলেটা হাতে নিয়ে দরবারেই সব টাকা বিলিয়ে দিলেন। থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগটিয়ে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পর ইমাম সাহেবের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা শতগুণে বৃদ্ধি পেলো। কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করলেন। আবদুল্লাহ বিন আলী তার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে বললো,

-আল্লাহর কসম! আমি আপনার মতো আর কাউকে ভয় করতাম না। আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল আমার সামনে একটা উদ্যত সিংহ দাঁড়িয়ে আছে!

জীবন জাগার গল্প : ৫১৭

ছাঁকনি!

পথচলা শুরু করে অনেকেই। শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে কয়জন? গুটিকয়েক। পথিমধ্যে ঝরে যায় অনেকেই! পুরো বিশ্বজুড়েই এখন ছাঁকার পর্ব চলছে বলেই আমার মনে হয়। যতই দিন গড়াচ্ছে হক-বাতিল পৃথক হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে অল্পসংখ্যক লোক।

মুসা আ. ইন্তেকাল করেছেন অনেকদিন আগে। তখন বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন শ্যামুয়েল (আ.)। আমালেকা নামক এক শক্তিশালী জাতি ইহুদিদের ওপর হামলা করেছে। আল্লাহর নবী তাদেরকে কিতালে বের হতে বললেন। ইহুদিরা বায়না ধরলো,

-আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ এনে দিন! তাহলে আমরা তার নেতৃত্বে জিহাদ করবো। আমালেকাদের নেতৃত্বে জালুতের মতো একজন বাদশা আছে। আমাদেরও এমন একজন চাই। আমাদেরকে ঘর-বাড়িছাড়া করা হয়েছে। এর একটা বিহিত করেই ছাড়বো। সর্বশেষ যুদ্ধে ইহুদিরা চরমভাবে মার খেয়েছিল। আমালেকা গোত্র তাদের কাছ থেকে পবিত্র 'তাবূত'-সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সিন্দুকটা ছিল ইহুদিদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। ওটাতে পূর্বের নবীগণের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কিছু ছিল। মুসা (আ.)-এর লাঠি। তুর পাহাড় থেকে নিয়ে আসা তাওরাতের ফলক (টেন কমান্ডমেন্টস) ও ছিল। ওটা ছিল তাদের কাছে চিত্তপ্রশান্তিকর। সিন্দুক হারিয়ে ইহুদিরা তো দিশেহারা। হায় হায় এবার কী হবে? আমরা তো আর জয়ী হতে পারবো না!

আল্লাহ নবীর দু'আ কবুল করলেন। ইহুদিদের জন্যে একজন বাদশাহ পাঠালেন। তালুত। দ্বিতীয় পারার শেষ দুই পৃষ্ঠায় এই আলোচনা আছে।

তালুত জ্ঞানে-গতরে বেশ দশাসই ছিলেন। একজন বাদশাকে যেমন হতে হয় তালুত ছিলেন ঠিক তাই। কোনও দিক দিয়েই কমতি ছিল না।

কিন্তু ইহুদিরা তালুতকে বাদশাহ হিশেবে মেনে নিতে সম্মত হলো না। নানা খুঁত বের করতে শুরু করে দিল। ইহুদিদের যেমন স্বভাব। সর্বকালেই তারা এমন গোঁয়ার গোবিন্দই ছিল। সোজা পথে হাঁটতো না। বাঁকাপথই তাদের কাছে সোজা পথ। নবীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তারা বললো,

-তালুত যে আল্লাহর মনোনীত নবী এর প্রমাণ কী? তার কাছে তো ধনসম্পদ নেই। এর চেয়ে তো আমরাই বাদশাহ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি যোগ্য।

-এর প্রমাণ হচ্ছে, তোমাদের ভীরুতার কারণে যে পবিত্র তাবুত আমালেকারা দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতার মাধ্যমে সিন্দুকটা তালুতের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। গিয়ে দেখে আসতে পারো। সিন্দুক যেহেতু তোমাদের কাছে ফিরে এসেছে তোমাদের ভাঙা মনোবলও নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে! আর তালুতের সম্পদ নেই তো কী হয়েছে, তার এলেম-শরীর তো ঠিক আছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।

ইহুদিরা ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলো। আরে তাই তো! আমাদের সিন্দুকই তো! তারা আর যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা খুঁজে পেলো না। তালুত দায়িত্ব হাতে পেয়েই বাহিনী গঠন শুরু করে দিলেন। ৭০ বা ৮০ হাজার সৈন্য যোগাড় হলো। ইহুদিরা বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করতে রাজি হয়েছিল। কারণ বিপক্ষ দলের সেনাপতি 'জালুত' ছিল ভয়ালদর্শন বিকট এক লোক। বিশাল তাগড়াই আলাদিনের দৈত্যমার্কা বপু! সমরক্ষেত্রে সে একাই কয়েক হাজার ছিল। যেদিকে ছুটতো সব তামা-ছাতু বানিয়ে ফেলতো।

ইহুদিরা তো কিতাল শুরুর আগেই শিবির ছেড়ে পালাতে শুরু করলো।শেষ পর্যন্ত টিকল ৭ হাজারের মতো লোক।

= যখন তাদের ওপর কিতাল ফরয করে দেয়া হলো, অল্পকিছু ছাড়া বাকীরা পালিয়ে গেলো (বাকারা: ২৪৬)।

এ-হিশেবে আমরা ধরতে পারি, তিনভাগের দুই ভাগ সৈন্যই পালিয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট ছিল ১০০%-এর মাত্র ৩০% ।তালুত পথ চলতে শুরু করলেন। পথে একটা নদী পড়লো। তিনি বললেন,

=আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দিয়ে পরীক্ষা করবেন। যারা নদীর পানি পান করবে, তারা মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যারা পান না করে

জমে থাকতে পারবে, তারাই প্রকৃত বাহিনী। তবে সামান্য এক কোষ খেলে সমস্যা নেই।

যখন নদী এল, অল্পকিছু ছাড়া সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে পানি পান শুরু করে দিল। তার মানে এবারও তিনভাগের দুই ভাগ সৈন্য ঝরে পড়েছে। বাকী থাকলো মাত্র ১০% সৈন্য। এদেরকে নিয়েই যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। নদী পার হওয়ার অবশিষ্ট মুমিন ইহুদিরা নিজেদের সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, পথশ্রমের ক্লান্তি, প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়লো। তারা মুখ ফিরিয়ে বললো,

-আজ আমাদের জালুত আর তার সেনাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো শক্তি নেই।

এদের মধ্যেও কিছু খাঁটি অকুতোভয় মুমিন ছিলেন। তারা বিশ্বাস করতো, জিহাদের ময়দানে শহীদ হলেই সরাসরি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত নসীব হবে। তারা দৃঢ়চিত্তে বললেন,

-কতো ক্ষুদ্র দলও বড় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিতেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন (২৪৯)।

যুদ্ধ শুরু হলো। অল্পসংখ্যক মুমিন আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করে গভীর আবেগের সাথে দু'আ করলেন,

-ইয়া রাব! আমাদেরকে সবর বর্ষণ করুন। আমাদেরকে অবিচল রাখুন। কাফেরদের বিরুদ্ধে নুসরাত দান করুন (২৫০)।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার আন্তরিক দু'আ অবশ্যই কবুল করেন। এবারও তাই করলেন। সাথে সাথেই। পরের বিজয় কামনা করে দু'আর পরপরই আল্লাহ বলেন,

-তারা আল্লাহর অনুগ্রহে আমালেকাদের পরজিত করলো। দাউদ হত্যা করলো জালুতকে। ছোট্ট একটা পাথর ছুঁড়েই জালুতকে কুপোকাত করলেন। রাজার মৃত্যুতে আমালেকারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প :৫১৮

আল্লাহর সন্ধান!

দুই ব্যক্তি মরুভূমির মধ্য দিয়ে সফর করছে। দু'জন আগে থেকেই কিছুট পরিচিত। একজন ব্যবসায়ী, আরেকজন কিছু করে না। কিন্তু গোপনে চুরি করে বেড়ায়। এ তথ্য ব্যবসায়ীর জানা ছিল। সেজন্য শুরু থেকেই ব্যবসায়ী সতর্ক। তার জানা ছিল, সুযোগ পেলেই, চোর তার ব্যবসার হীরাগুলো চুরি করে পালাবে।

.

চোরসঙ্গীও তক্কে তক্কে আছে, কিভাবে ব্যবসায়ীর হীরাগুলো চুরি করা যায়! চোর তো আর জানে না, তার চোরামির খবর ব্যবসায়ীর অগোচর নেই! ব্যবসায়ী রাতে ঘুমিয়ে পড়ার, চোর পর পর কয়েকদিন সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজল, কিন্তু কোথাও হীরার হদিস পেল না।

.

গন্তব্যে পৌছার পর, চোর আড় ভেঙে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।
-ভাই! আপনার হীরাগুলো কোথায় রাখতেন? এত খোঁজাখুঁজির পরও সেগুলো পেলাম না?
-তুমি সব জায়গাতে খুঁজেছ?
-জি, এমনকি আশেপাশের বালুর নিচের পর্যন্ত খুঁজেছি! এই যে দেখুন, আমার হাতের নখগুলো পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে গেছে!
-না তুমি সবখানে খোঁজনি। আমি হীরাগুলো রাতে শোয়ার আগে, তুমি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে দূরে যেতে, তখন তোমার সামানার মধ্যে রেখে দিতাম। আবার সকালে তুমি দূরে গেলে নিয়ে নিতাম।

.

আমাদের অবস্থাও এমনি! আমরা মনে করি, আল্লাহকে পেতে হলে, অন্য কারো সাহায্য লাগবেই! আমার অন্ধকার-পাপী-তাপী হৃদয়ে আল্লাহ থাকতে পারেন না, তিনি বুযুর্গদের কাছেই থাকেন। সেজন্য আমরা আল্লাহর পেতে প্রথমেই তাদের কাছে ছুটে যাই! একথা খেয়াল করি না, তিনি আমাদের মধ্যেই বাস করেন।
আমরাও চোরের মতো, বিভ্রান্ত হয়ে, যেখানে আল্লাহ সবসময় পাওয়ার কথা সেখানে না খুঁজে দূরে কোথাও খুঁজি!

জীবন জাগার গল্প : ৫১৯

কচ্ছপ ও খরগোশ!

-খরগোশ ও কচ্ছপের প্রতিযোগিতার কথা সবাই জানি। কিন্তু আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ। পুরোটা আমরা জানি না।

-তাহলে পুরোটা কী?

-বলছি!

.

প্রথম পর্যায়!

কচ্ছপ আর খরগোশের মধ্যে জোর বিতর্ক! কে বেশি দ্রুতগামী! শেষে ঠিক হলো দু'জনে একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে।

.

খরগোশ তীর বেগে ছোটা শুরু করলো। অনেকদূর যাওয়ার পর দেখলো, কচ্ছপ এখনো বহু দূউউরে! ঠিক আছে, তার আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। এই ফাঁকে, গাছের ঝিরিঝিরি শীতল ছায়ায় একটু ঘুমিয়ে নিই। সে কাছাকাছি এলেই একছুটে বাকি পথটুকু পেরোনো যাবে!

.

খরগোশ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে জেগে দেখে, সে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। কচ্ছপ গন্তব্যে গিয়ে বসে আছে!

.

গল্পের শিক্ষা:

ধীরগামী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞরাই প্রতিযোগিতায় জেতে!

.

এটা ছিল সবার জানা গল্প। আমাদের গল্প কিন্তু এখনো শেষ হয়নি।

.

দ্বিতীয় পর্যায়!

খরগোশের ভীষণ মন খারাপ। ইশ! অলসতা অবহেলা না করে, দৌড় অব্যাহত রাখলে, এখন বসে বসে আঙুল কামড়াতে হতো না। আমার হারের কারণ কী?

-হ্যাঁ, অতি আত্মবিশ্বাসই আমাকে ডুবিয়েছে। আমি প্রতিপক্ষকে 'আন্ডার এস্টিমেট' অবমূল্যায়ন করেছি। আমার দৌড়শক্তি আমাকে অহংকারে ফেলেছে! এখন কী করা যায়? হেরে যাবো? উঁহু! হতেই পারে না! তাহলে কি কচ্ছপকে আবার প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দেয়া যায়? সে মানবে? দিয়েই দেখি না!

.

কচ্ছপ এক কথায় রাজি! শুরু হলো দৌড়। খরগোশ বিদ্যুৎ বেগে দৌড় শুরু করলো। কোথাও থামাথামি নেই। এক্কেবারে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এবার জেতা গেছে! আহ! প্রথমবারও যদি এভাবে একটানা চালিয়ে যেতাম!

.

গল্পের শিক্ষা :

যারা দ্রুতগতিতে একটানা দৌড়াতে পারে, তারাই জিততে পারে। ধীরগামী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞরাও তখন পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়!

.

হাঁ, ধীরগামী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া প্রশংসনীয়! তবে এর পাশাপাশি কাজের প্রয়োজনের সময় দ্রুতগামী আর নির্ভরযোগ্য হওয়া যায়, আরও বেশি ভাল!

.

গল্প আরও বাকী আছে। কচ্ছপ হেরে যাওয়ার পর, বুঝতে পারলো, বর্তমান 'ফরম্যাটে' খরগোশের সাথে পেরে ওঠা যাবে না। ভিন্ন কোনও পন্থায় বা অন্য কোনও রাস্তায় প্রতিযোগিতায় নামতে হবে! খরগোশ নতুন পথে দৌড়ে নামতে রাজি হলো। শুরু হলো দৌড়। সাঁই করে খরগোশ বেরিয়ে গেলো। জেতার সূত্র তার জানা হয়ে গেছে: দ্রতগামিতা আর নিরবিচ্ছিন্নতা!

.

মাঝপথে গিয়েই খরগোশকে হার্ডব্রেক কষে দাঁড়াতে হলো। সামনেই দৌড়পথকে আড়াআড়ি বিচ্ছিন্ন করে, একটা খরস্রোতা নদী বয়ে চলছে! হায়! হায়! আগে এসে একবার পথটা দেখে গেলাম না কেন? এখন কী হবে? এসব ভাবতে ভাবতেই, কচ্ছপ তাকে পাশ কাটিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে গেলো। দৃষ্টিসীমার বাইরে!

.

গল্পের শিক্ষা:

আগে নিজের যোগ্যতার সীমা যাচাই করে নেয়া চাই। নিজের সামর্থের দৌড় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই! তারপর সে অনুযায়ী দৌড়ক্ষেত্র বাছাই করা চাই! না জেনে, না বুঝে, খোঁজ-খবর না নিয়েই নেমে পড়া ঠিক নয়।

.

গল্প শেষ হয়নি। তবে শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। কচ্ছপ বুঝতে পারলো, এবারের প্রতিযোগিতাটা অসম হয়ে গেছে। কিছুটা ভারসাম্যও হারিয়েছে। নিজের অপরাধবোধ থেকেই, যেচে গিয়ে খরগোশের সাথে কথা বললো। দু'জনের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও সময় লাগলো না। তবে যৌথসিদ্ধান্ত হলো:

আমরা আবার দৌড়াবো। তবেএবার হবে দলবদ্ধ দৌড়। দু'জনে একটা দল হয়ে।

.

চতুর্থ পর্যায়!

শুরু হলো। একসাথে তীরে পৌঁছল। কচ্ছপ পিঠে চড়িয়ে খরগোশকে পার করে দিল। নদীর অপর পাড়ে গিয়ে, খরগোশ কচ্ছপে পিঠে চড়িয়ে নিল। এক ভোঁ দৌড়ে বাকি পথটুকু শেষ করলো।

উভয়েই বেজায় খুশি! মনে দারুণ আনন্দ। হৃদয়ে তৃপ্তি। কেউ হারেনি। দু'জনেই জিতেছে! এত ভালো আগে আর কখনো লাগেনি!

.

গল্পের শিক্ষা:

এক: ব্যক্তিগতভাবে মেধাবী হওয়া, যোগ্য হওয়া ভাল। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলে, অনেক বেশি ফলোদয় হয়। কারণ, কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, যা আমার পক্ষে সামাল দেয়া অসম্ভব! কিন্তু দলের কারো না কারো কাছে সেটা ডালভাত!

.

দুই: দলবদ্ধ কাজের অনেক উপকারিতা:

ক: অল্প সময়ে অনেক কাজ হয়।

খ: বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্যে খুঁজে বের করে আনে।

গ: কাজের গতি সবসময় সচল থাকে।

জীবন জাগার গল্প : ৫২০

এমন যদি হতো!

আমরা আনন্দে অভিভূত হলে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার কাছে ছুটে যাই। আবার যখন শোকাহত হই আমাকে যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে তার কাছে ছুটে যাই। উভয় অবস্থাতেই একজনের কাছে যারা ছুটে যেতে পারে তারা কতই না সৌভাগ্যবান! কতই না সুখী!

***

কিছু মানুষ আছে, তারা এমন এক অপূর্ব ও অমূল্য বইয়ের মতো, যার মলাটটা বড়ই শাদামাটা, কিন্তু ভেতরটা? এক কথায় অনন্য। আবার কিছু মানুষ আছে যাদের মলাট বড়ই মনোহর, চিত্তহারী কিন্তু ভেতরটা শূণ্য-ফাঁপা। আমি শুধু আমার মলাট নয়, ভেতরটাকেও ....।

***

দোষ স্বীকার করেছে বলেই যে সে দোষী বা দুর্বল তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। দোষ স্বীকার করাটা এক দুর্লভ গুণ। একমাত্র সত্যিকার বিনয়ীরাই দোষ স্বীকার করতে পারে।

***

যখন আমরা একটা জন্মভূমি পাই, তখন জন্মভূমির অগ্রনায়েকেরা থাকে কবরে, বীর সেনারা জেলে, আর চোরেরা সব প্রাসাদে।

***

দুনিয়াতে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যখন ইমাম-নেতা ভুল করলেও লোকমা দেয়ার মতো কেউ থাকে না। আর অনুষ্ঠানে পুরো সময় থাকাটাই অসম্ভব হয়ে যায়, যখন গায়ক একটা শুরু করলে বাকিরাও তা গাইতে শুরু করে।

***

ইহুদিরাই (পশ্চিমারা) যে শুধু মেধাবী আর আমরা মুসলিমরাই শুধু মেধাহীন ব্যাপারটা এমন নয়। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তারা ব্যর্থদেরকে সফল হওয়া পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতা করে আর আমরা সফলদেরকে ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত ধাওয়া করি।

***

যখনই তার কাছে বিস্রস্ত-বিপর্যস্ত হয়ে আসবো, ফিরে যাওয়ার সময় সে বিপর্যয় থাকবে না। যখনই তার কাছে দুর্বল হয়ে আসবো, ফিরে যাওয়ার সময় শক্তিমান হয়ে ফিরবো। এমন একজন বন্ধু থাকলে জীবনটা কতই আনন্দময় হয়!

জীবন জাগার গল্প : ৫২১

ইমাম হাতেপ স্কুল

তুরস্কের ধর্মশিক্ষা

কামাল খেলাফত ধ্বংস করেই কামাল ক্ষান্ত হয়নি। ধর্মকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার সব ব্যবস্থাই সে গ্রহণ করেছিলো। আরবি ভাষার ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছিলো। আজান-কুরআন সবকিছুকে ল্যাটিন বর্ণমালায় (বর্তমান ইংরেজি অক্ষরে) লিখতে বাধ্য করেছিলো।

***

তুর্কি সরকার প্রথম দিকে আইন করে, সমস্ত মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য একটি কারিকুলাম বেঁধে দিয়েছিলো। সেই কারিকুলামে কোনও ধর্মীয় শিক্ষা ছিলো না।

***

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেয়ার পর একটা সমস্যা দেখা দিল। পুরো দেশের মসজিদগুলোতে সরকারি ইমাম নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিল। উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছিলো না। ধর্মীয় শিক্ষা যদি একেবারেই দেয়া না হয়, তাহলে নগরীর মসজিদগুলোতে ইমামতি করবে কে? আর তাদের যোগ্যতাই বা কিভাবে নিরূপণ করবে

সরকার? এই সমস্যার সমাধানের জন্যেই একটি বিশেষ ভোকেশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার নাম দেয়া হয়েছিলো ইমাম হাতেপ স্কুল, বা ইমাম-খতীব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

***

এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পর অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া হয় তুর্কী সমাজে। সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শতগুণ উচ্চমানের সুযোগ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ইসলামী বিষয় অন্তর্ভুক্তির কারণে ধর্মীয় শিক্ষার উপর আস্থাশীল পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে শুরু করে ইমাম প্রশিক্ষণের এই স্কুলে। যেহেতু এই স্কুল থেকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজেই যে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিলো তাই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেক্কা দিয়ে একে একে তুরস্কের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠতে থাকে হাতেপ স্কুলের শাখা। আর একটা পর্যায়ে এসে জনপ্রিয়তায় সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করে এসব ধর্মীয় স্কুল। ইতিহাসের এই ঘটনাকে কোন বিশেষণে প্রকাশ করা যায়? সরকারের চাপিয়ে দেয়া সেক্যুলার শিক্ষার প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনীহা? ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিয়মতান্ত্রিক সমর্থন? নাকি একটি নীরব শিক্ষা বিপ্লব?

***

হাতেপ স্কুলসমূহে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভোকেশনাল স্কুল হিসেবে প্রথমে যাত্রা শুরু করলেও এখানকার শিক্ষার পরিবেশ কিন্তু অন্য স্কুলগুলো থেকে ভিন্ন কিছু ছিলো না। সিলেবাসের ৪০% বরাদ্দ করা হয়েছিলো আরবি, ইসলামী জুরিস্প্রুডেন্স (ফিকহ) আর অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর জন্য, আর বাকি ৬০% এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো।

***

এই স্কুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মসজিদের ইমাম তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে শুধু ইসলাম-ধর্ম-ই শিক্ষা দেয়া হয় না, বরং খ্রিস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ সহ অন্যান্য ধর্মের উপরও সমান ধারণা দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের। আবার কোনও শিক্ষার্থী যদি মনে করে সে ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে না পড়ে অন্য কোনও বিষয় নিয়ে সাধারণ স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করবে, তবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

এই ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাই নজর কেড়েছে সারা বিশ্বের শিক্ষানুরাগীদের।

***

এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের সমন্বয়। কিভাবে তুরস্কের মতো একটি রীতিমত ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রে ইসলামপন্থী একেপি পার্টি পর পর তিন বার জয় লাভ করে তার কারণ খুঁজতে গেলেও মূলে দেখা যাবে এই হাতেপ স্কুলগুলোকে।

***

রজব তাইয়্যেব এরদুগানও হাতেপ স্কুলের একজন সাবেক ছাত্র। সেই হাতেপ স্কুলের সাবেক একজন ছাত্রই নেতৃত্ব দিচ্ছেন আজকের তুরস্ককে।

(সংগৃহীত ও পরিমার্জিত)

জীবন জাগার গল্প : ৫২২

মতভেদ

ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ.)। ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) এর শাগরিদ ছিলেন। একটা মাসআলায় উস্তাযের সাথে তার মতবিরোধ দেখা দিল।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তখন মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ তর্ক করারও পরও মতের মিল না হওয়াতে ইউনুস রাগ করে দরস থেকে উঠে গেলেন। ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

***

রাত ঘনিয়ে এল। ইউনুস শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দরজায় টোকা পড়লো। ইউনুস কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন,

-কে?

-আমি মুহাম্মাদ বিন ইদরীস।

ইউনুস পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন:

-নামটা শুনে আমি স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু এই নামে কাউকে চিনি বলে মনে করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ ভাবনার পর কয়েক জন মুহাম্মাদ বিন ইদরীসের কথা মনে এল। কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও আমার উস্তায শাফেয়ীর (রহ.) কথা মাথায় আসেনি।

দরজা খুলে দিলাম। ও মা! স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কী করবো, কী বলবো ভেবে কূলকিনারা করে উঠতে পারছিলাম না। আমার বিচলিত অবস্থা দেখে, তিনি বলে উঠলেন:

-স্নেহের ইউনুস! আমরা তো শতশত মাসয়ালায় একমত হতে পেরেছি। কিন্তু এই একটা মাসয়ালায় ভিন্নমত হওয়ার কারণেই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এলে?

(ওপরের ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা যায়)

-সব ঝগড়ায় জয়ী হতে চাওয়া কিছু বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কখনো কখনো হৃদয় জয় করা তর্কে জয়ী হওয়ার চেয়ে বেশি উত্তম।

.

-যে সাঁকো আমি নিজ হাতে বানিয়েছি, সেটা দিয়ে শতবার নদী পার হয়েছি, সেটাকে ভেঙে ফেলা ঠিক নয়, বলা তো যায় না, হয়তো ফেরার পথে সেটা কাজে লাগতেও পারে।

.

-পাপকে ঘৃণা করা সাজে, পাপীকে নয়।

.

-সর্বান্তকরণে পাপকে ঘৃণা করাটা ঠিক আছে, কিন্তু পাপীকে ক্ষমা করে দেয়াটা মহত্ত্ব।

.

-আমরা বক্তব্যটাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারি, সমালোচনার আওতায় আনতে পারি, কিন্তু বক্তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি কেন?

.

-আমাদের দায়িত্ব তো সমাজের রোগবালাই দূর করা, নির্মূল করা। কিন্তু রুগীকে নির্মূল করা, মেরে ফেলা তো আমাদের উচিত নয়!

.

-সবকাজে জোর করে আদর্শ হতে চাওয়াটা কি ঠিক? এটা কি সম্ভব?

.

-আমাদের কাছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ এলে তার কাজের সমালোচনা না করে, চুপ করে তার সবকথা শুনবো।

.

-আমাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এলে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার চেষ্টা করবো।

•

-আমাদের কাছে কোনও প্রার্থনাকারী এলে, তার যথাসাধ্য উপকার করার চেষ্টা করবো।

•

-আগে কোনও সময় অপরের পথে কাঁটা পুঁতে রেখে থাকলেও, এখন গোলাব বিছিয়ে দিতে কি কোনও সমস্যা আছে?

জীবন জাগার গল্প : ৫২৩

চামচরীতি

মালিক বিন নবি। একজন কুরআন গবেষক। কুরআন কারীম নিয়ে তার বিখ্যাত কিছু রচনা আছে। তার স্মৃতিচারন:

-১৯৩০ সালের কিছু পরের কথা। আমি শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে আমি ফ্রান্সে উচ্চডিগ্রি নিতে গিয়েছি। আমাদের আলজেরিয়া থেকে তখন অনেকেই ফ্রান্সে যেত। দেশতো তখন এক ছিল। বেশি ঝামেলা পোহাতে হতো না।

আমি সাধারণত রান্না করেই খেতাম। একদিন ভার্সিটিতে কাজের চাপ পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে একটা ক্যাফেতে খাওয়া সারতে গেলাম। পুরো ক্যাফেটোরিয়া ছাত্রছাত্রীতে গিজগিজ করছে। কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে, কী করা যায় ভাবছি।

দূরে এককোনে দেখলাম এক টেবিলে একটা আসন খালি আছে। আরেক পাশে দুইটা মেয়ে খাবার খাচ্ছে। বেশভূষা দেখে মনে হলো, তারা আমার ভার্সিটিরই ছাত্রী। কিন্তু তাদের খাওয়ার ধরন দেখে মনে হলো, তারা অভিজাত কোনও পরিবার থেকে এসেছে।

আমি অনুমতি নিয়ে বসে পড়লাম। খাবারের অর্ডার করে চুপচাপ অপেক্ষা করছি। খাবার এল। আমি আমাদের আলজেরিয়ার রীতি অনুযায়ী, হাতা গুটিয়ে হাত দিয়েই খেতে শুরু করলাম। লক্ষ্য করলাম মেয়ে দু'টো আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম, আমার হাত দিয়ে খাওয়াটা তারা মেনে নিতে পারছে না। একজন ফস প্রশ্ন করে ফেললো:

-তুমি সবার মতো চামচ ব্যবহার করছো না কেন? হাত দিয়ে খেতে তোমার ঘেন্না লাগছে না?

আমি মুখের খাবারটুকু গিলে আত্মবিশ্বাসের সাথে বললাম,

-চামচ বানানো হয়েছে যাদের হাত ময়লা তাদের জন্যে। আমি আমার হাত সব সময় পরিষ্কার রাখি। দিনে কমপক্ষে পাঁচবার ধুই।

আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি।

চামচ দিয়ে খাবার খাওয়ার প্রচলন কে করেছে সেটা জানো?

-জি না। আমরা তো ছোটবেলা থেকেই চামচ দিয়ে খেয়ে আসছি।

-তাহলে শোন! চামচ দিয়ে খাওয়ার প্রচলন কিন্তু একজন মুসলিমের করা।

-এটা তো অবিশ্বাস্য! কে তিনি?

-তিনি হলেন আমার মতোই একজন কালো মানুষ। মুসলিম বিজ্ঞানী-সংগীতজ্ঞ-ফ্যাশন বিশেষজ্ঞ 'যিরয়াব'। তিনিই বাগদাদ থেকে স্পেনে এসে, খলীফা আব্দুর রাহমান (২য়)-এর দরবারে এ রীতির উদ্ভব ঘটান।

জীবন জাগার গল্প : ৫২৪

সুধারণা!

বুড়োর কাজ হলো প্রকৃতির ছবি আঁকা। চারপাশের দৃশ্যকে খুবই সুন্দর আর নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কারো কাছে শিখতে হয়নি। নিজের আগ্রহেই আঁকতে আঁকতে আঁকিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম দিকে কষ্ট হলেও এখন ছবি বিক্রি করে বেশ আয়-রোজগার হচ্ছে।

.

বুড়ো চিত্রকরের তুলনায় আশেপাশের মানুষ গরীব আর খেটে খাওয়া। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে চাপা ঈর্ষাও কাজ করে। কেউ কেউ তো তাদের ক্ষোভও ঝাড়ে:

-আমরা এক কষ্ট করেও দানাপানি রোজগার করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি! আর বুড়োটা সারাদিন আরামে ঘরে বসে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে বড় বড় পয়সাওলা এসে, মোটা টাকা দিয়ে ছবি কিনে নিয়ে যায়!

.

চিত্রকরের প্রতি ক্ষোভের যুক্তসঙ্গত কারণও আছে। বুড়ো কারো খোঁজ-খবর রাখে না। সারাক্ষণ নিজের আঁকাআঁকি নিয়েই মজে থাকে। গ্রামের মানুষ যে

না খেয়ে ধুঁকছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বুড়ো নিজ হাতে একটা কানাকড়িও দান করে না।

.

ক'দিন আগে গ্রামের ওপর দিনে তুফান বয়ে গেলো। কই তখন বুড়ো একটুখানি বেরিয়ে দেখেনি, কতো দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মানুষ ছিলো।

.

বুড়োর তুলনায়, তার ছোট ভাইকে সবার পছন্দ। লোকটা গঞ্জের হাঁটে চালের ব্যবসা করে। ছোটখাটো একটা আড়ৎ আছে। গরীব-গোরবা তার দোকানে গেলে খালি হাতে ফেরে না। চালের দাম কিছু কম দিলেও কিছু বলে না।

.

এছাড়া প্রতিদিন বেশকিছু ফকীরকে বিনামূল্যে চালদান করে। সবার বিপদাপদে পাশে দাঁড়ায়। যতোট সম্ভব খায়-খিদমত করে। এইতো এবার তুফানের সময় তো তার চালের কারণেই আল্লাহ গ্রামবাসীকে ভুখানাঙ্গা রাখেন নি। খুঁদ বা ফ্যান, যা হোক পেটে কিছু একটা পড়েছে।

.

এদিকে দিন দিন বুড়ো রোজগারপাতি বেড়েই চললো। মানুষের চোখ টাটানিও পাল্লা দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ বাড়লো। কিন্তু কিছু করার তো ছিল না। তাই চুপচাপ হিংসেয় জ্বলাপোড়া ছাড়া তাদের কিছুই করার ছিল না।

.

অতি পরিশ্রমের কারণে, বুড়ো চিত্রকর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। গ্রামবাসী বেজায় খুশি। যাক, হাড়কিপটে বুড়োর ওপর সবার বদদু'আ পড়েছে।

.

চিত্রকরের রোগা শরীর অসুখের ধকল সইতে পারলো না। কয়েক দিন পর মারা গেলো। সবাই তাকে বয়কটা করলো। কেউ শেষকৃত্যে অংশগ্রহন করলো না। চাল ব্যবসায়ী ভাই নিজের দোকানের লোকদের নিয়েই সব কাজ সারলো।

.

সপ্তাহ না গড়াতেই গ্রামে হাহাকার শুরু হলো। কারণ? চাল ব্যবসায়ী ভাই ঘোষণা দিয়েছে:

-আমি আর দান-খয়রাত করতে পারবো না। আমার পুঁজিতে টান পড়েছে।

.

গরীবরা তো বটেই অবস্থাপন্নরাও তার বাড়িতে হত্যে দিয়ে পড়লো:

-ভাই! তুমি মুখ তুলে না তাকালে এতগুলো মানুষ যে না খেয়ে মরবে!

-না আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

-কেন? এতদিন তো পেরেছো?

-আমি সঠিক কারণটা বলতে পারবো না।

.

সবার জোরাজুরিতে শেষমেষ চালব্যবসায়ী মুখ খুলতে বাধ্য হলো:

= আমি কথাটা না বলতে পারলেই ভালো হতো। ওয়াদাভঙ্গের গুনাহ থেকে বাঁচা যেতো। কিন্তু এখন না বললেও চলছে না। শোন গ্রামবাসীরা! আমি এতদিন যা কিছু দান করেছি, চাল দিয়েছি, গরীব ছাত্রদের পড়ালেখার খরচ চালিয়েছি, সবই বড় ভাইয়ের টাকায়। তিনি যা রোজগার করতেন, আমার হাতে তুলে দিতেন। নিজের জন্যে পাই-পয়সাও রাখতেন না। তিনি বলতেন, কী হবে এসব রেখে? কে খাবে? আমার তো সন্তান-সন্ততি নেই। গ্রামের দুঃখী মানুষগুলোই আমার সন্তান।

-এসব তুমি আগে বলোনি কেন?

-তিনি আমাকে কঠিন করে ওয়াদা করিয়েছিলেন। আমি যেন তার ভূমিকাটা গোপন রাখি। এমনকি তার মৃত্যুর পরও যেন ফাঁস না করি!

-তিন এমনটা কেন করলেন?

-তিনি বলেছিলেন, আমি নিজ হাতে এসব করতে গেলে, মানুষ আমাকে দানবীর বলবে, আমার দুয়ারে এসে ভীড় জমাবে। তখন আমার কাজের ক্ষতি হবে। কাজের ক্ষতি হলে, ছবি বিক্রি কমে যাবে। এতে গরীব মানুষগুলোরই ক্ষতি!

জীবন জাগার গল্প : ৫২৫

বিচক্ষণ কাজী!

কাযির দরবার এখন খালি। দু'জন লোক প্রবেশ করলো। একজন চল্লিশোর্ধ। আরেকজন ষাটোর্ধ। হাতে একটা মোটা লাঠি। পেশকার তাদের মামলা কাযির বরাবরে রুজু করলো।

.

-হুযুর! আমি আমার এ-বৃদ্ধ প্রতিবেশীর কাছে দশটা স্বর্ণের পাত গচ্ছিত রেখেছিলাম। আমি চাইলেই ফেরত দিবে, এই ছিল শর্ত। কিন্তু এখন আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে অযথা কালক্ষেপন করছে।

-কী অভিযোগ সত্যি?

-জ্বি আমার কাছে দশটা স্বর্ণের পাত আমানত রেখেছিল। কিন্তু আমি তো তার কাছে সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি!

-তুমি কসম করে বলতে পারবে?

-জ্বি পারবো।

.

বৃদ্ধ প্রতিবেশী হাতের লাঠিটা 'আমানতদাতা'-এর হাতে দিয়ে, দৃঢ়কণ্ঠে শপথ করলো:

-আমি স্বর্ণের পাতগুলো তাকে ফেরত দিয়েছি।

.

বিচারক বিশ্বাস করলেন। অভিযোগকারীকে ভর্ৎসনা করলেন, অযথা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হয়রানি করার জন্যে। সে ব্যক্তিও দ্বিধায় পড়ে গেলো। উল্টো বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইতে হলো।

.

মামলা ডিসমিস। বৃদ্ধ লাঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটা দিল। কাযি সাহেব তাদের গমনপথের দিকে আনমনে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তার দরজা পার হয়ে প্রায় বের হয়ে যাচ্ছে, আচমকা কাযি সাহেব তড়কা ভেঙ্গে বলে উঠলেন:

-দু'জনকে আবার হাযির করো!

•

বৃদ্ধকে বললেনঃ

-আপনার লাঠিটা একটু দেখি?

কাযি সাহেব লাঠিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। বেশ মোটা লাঠি। ভারীও বটে। কী মনে করে লাঠির হাতলটা ধরে মোচড় দিলেন। মাথাটা খুলে ঝুর ঝুর করে স্বর্ণের পাত ছড়িয়ে পড়লো।

•

সবাই অবাক! এমনকি বৃদ্ধ পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠবে কি, অবাক-বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এ কী করে সম্ভব? পেশকার সরাসরি জিজ্ঞেসই করে ফেললো:

-কীভাবে বুঝলেন?

-বৃদ্ধ যখন শপথ করার সময় লাঠিটা বাদীর হাতে দিল, তখন কেমন যেন লেগেছিল। এমন শত্রুতার সময় প্রতিপক্ষের হাতে লাঠি দিতে একটুও বাধলো না! আবার দুহাত তুলে শপথের সময়ও মনে হলো বৃদ্ধ প্রথমবারের তুলনায়, স্বর্ণ ফেরত দেয়ার কথাটা একটু বেশি জোরের সাথে বলেছে। তার মানে প্রথমবার বক্তব্যের সাথে সত্যতার সংযোগ দুর্বল ছিল। দ্বিতীয় জোরের সাথে দাবি করার সময় বক্তব্যের সাথে সত্যের সংযোগ বেশি ছিল। কিন্তু তখনো কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। আমি মামলা ডিসমিস করার পর বৃদ্ধ খুশি হলো। কিন্তু লাঠিটা হাতে নেয়ার পর তার চেহারায় খুশির মাত্রা হঠাৎ করেই বেড়ে বেড়ে গেলো, মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন?

এরপর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহের বীজ জেগে উঠলো। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতোই লাঠিটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হলো! এরপর তো দেখলেই! বৃদ্ধ অত্যন্ত ধুরন্ধর! মিথ্যাও বলেনি। আবার আমানতও ফিরিয়ে দিয়েছে! অগোচরে ফেরতও নিয়েছে!

জীবন জাগার গল্প : ৫২৬

দাওয়াতের ময়দানে!

-

ঘটনাটা জানা। তিনি অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে পথিকৃতের মতো। তবুও তাকে আবার জানলে ক্ষতি কী?। শায়খ দীদাত রহ.-এর কথা বলছি। তার একটা স্মৃতিচারণ চোখে পড়লো,

-আমি তখন এডামস মিশনের অদূরে এক দোকানে চাকুরি করি। মিশনটা ছিল খ্রিস্টান যাজকদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। তাদেরকে শেখানো হতো, কিভাবে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করা যাবে। কিভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। কোন কথা বললে সাধারণ মুসলমানকে ফাঁদে ফেলা যাবে।

-

আমাদের দোকানেও তরুণ যাজকরা আসতো। এটাসেটা কিনতো। টুকিটাকি কেনাকাটার ফাঁকে টুকটাক কথাও হতো। তারাই আগ বেড়ে কথা বলতে চাইতো। সদ্য শেখা বুলি দিয়ে আমাদেরকে 'গিনিপিগ' বানানো যায় কিনা তারই রিহার্সাল চালাতো হয়তো বা।

-

প্রশিক্ষণ যতই সমাপ্তির দিকে গড়াতে লাগলো, পাতি যাজকদের বোলচালের ধরন পাল্টাতে লাগলো। তাদের ভাবভঙ্গিতে বেশ আত্মবিশ্বাস ঠিকরোতে শুরু করলো। মুখের ভাষা আক্রমণাত্মক ও শাণিত হয়ে উঠলো।

-

আমরা যারা দোকানী ছিলাম, তাদের সাথে কথায় পেরে উঠতাম না। তাদের স্পর্ধা দিন দিন লাগামছাড়া হতে লাগলো। এক তরুন যাজক কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে বলে বসলো

-মুহাম্মাদ নারীলোভী ছিলো। সেজন্যই গণ্ডাখানেক বিয়ে করেছে! নাউযুবিল্লাহ!

আরেক ব্যাটা বললো:

-ইসলাম তো তলোয়ারের জোরেই প্রচারিত হয়েছে। আমাদের খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়েছে ভালোবাসা-সেবা ও ক্ষমার মাধ্যমে!

-

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মাথার চুল ছিঁড়ছিলাম অসহায় আবেগে! আমি নিজের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না! আর ওরা আমার সে না জানার সুযোগ নিয়ে যা তা বলে পার পেয়ে যাবে! সারাক্ষণ চিন্তাটা মাথার মধ্যে কুন্ডুলি পাকিয়ে ঘুরপাক থেকে লাগলো।

.

কাটা ঘায়ে নুন ছিটানোর মতো পরদিন আরেক জন এসে মুখের ওপরই বলে দিলো:

-মুহাম্মাদ তো ইহুদি-নাসারাদের কাছেই কিতাব শিখেছে। সেটাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে!

.

আমার তখন মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারছি না। মুখে একটা বোকা হাসিয়ে ফুটিয়ে তাদের কথা শুনি। গাঁইগুই করে তো কাজ হবে না। তাদের সাথে লড়তে হলে চাই যুক্তি। চাই তথ্য।

.

একবার ভাবলাম পালিয়ে যাই। এখানে থাকলে হয় আমাকে খ্রিস্টান হতে হবে, না হয় আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। চাকুরির মন্দার বাজারে, এমন লোভনীয় চাকুরি ছাড়লে ফিরে পাওয়া যাবে না। এ-চিন্তা বাদ দিলাম।

.

ভেতরে ভেতরে বিভিন্ন বিষয়ে জানার আগ্রহ তুঙ্গে। খ্রিস্টানদের খোঁচাখুঁচিতে জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছিল যেন। কিন্তু এসব বিষয়ে কোথায় পড়বো। কার কাছে পড়বো?

.

এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে, মালিকের গোডাউনে একটা কাজে গেলাম। ওখানে বেশ কিছু বইপত্তর রাখা ছিলো। পড়ার কিছু পাই কি না, সে আশায় কাগজপত্রের দঙ্গল-স্তূপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করলাম। কী খুঁজছি নিজেও জানি না। আমি পড়ুয়া মানুষ ছিলাম। ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা না করলেও, নিয়মিত পড়ার অভ্যেস ঠিকই 'জীবিত' ছিল। মনের মধ্যে হয়তো পড়ার নতুন কিছু পাওয়ার কামনাও জেগে থাকতে পারে।

.

কাগজের ঢিবি ঘাঁটতে গিয়ে নিচের দিকে, উইয়ে খাওয়া-পোকায় কাটা একটা শতচ্ছিন্ন বই হাতে উঠে এলো। মলাটে লেখা: ইযহারুল হক। অর্থটা বুঝলাম না। নিচেই ইংরেজীতে নামের অর্থের ওপর চোখ পড়লো। এবার বুঝতে পারলাম। ১৯১৫ সালে ভারত থেকে ছাপা হয়েছে বইটা। আমার চেয়ে তিন বছরের বড় বইটা। আমি তো ১৯১৮ তে।

.

বইটা হাতে পেয়ে আমার জীবন বদলে গেলো। পেশা বদলে। লক্ষ আমূল বদলে গেলো। বদলে গেলো ইতিহাস। শুরু হলো প্রতিআক্রমণ। শুরু হলো প্রত্যুত্তর। পাল্টা আঘাত। আফ্রিকা থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়লো লন্ডনে। নিউইয়র্কে। সারা বিশ্বে।

.

আর হাঁ, যাজকদের দোকানে আসা সেই কবেই বন্ধ হয়ে গেছে! তারা পরের দিকে আমাকে দেখলেই ভিন্ন পথ ধরতো! দোকানের বিক্রিবাট্টা কমে গেলেও, আখিরাতের পুঁজিপাতি বেড়ে যাওয়াতে, কোনও আফসোস রইল না। থাকবে কেন?

জীবন জাগার গল্প : ৫২৭

চা-মাখা হাসি!

জিদ্দার এক অভিজাত কিন্ডারগার্টেন। একজন শিক্ষক কমনরূমে বসে বসে সেদিনের পত্রিকায় চোখ বোলাচ্ছেন। ইয়েমেনে হামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে লেখা একটা বিশ্লেষণধর্মী উপসম্পাদকীয় পড়ছেন। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। প্রতিদিনই এমন হয়। প্রথম ক্লাসে যাওয়ার আগে গলাটা খরখর করতে থাকে।

বেয়ারাকে ডেকে একটা চা আনতে বললেন। লোকটা ফিলিপিনের। চা বানায় ভালো। ঝটপট চা হাজির। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই জিবে কামড়! এই রে! চা থেকে গেলে ক্লাসে দেরী হয়ে যাবে। প্রধান শিক্ষক তো সাক্ষাত আজরাঈল! এক মিনিটও এদিক-সেদিক হওয়ার জো নেই। কাঁটায়-কাঁটায় ক্লাসে হাজির হওয়া চাই।

এখন চায়ের কী হবে? আর যাই হোক এখন তো খাওয়া যাবে না। তারচে বরং ওই মানুষটাকে দিয়ে দেয়া যাক। হেডস্যার সম্পর্কে একটা কথা মনে

পড়ে যাওয়ার হাসি পেলে। আপন মনে মিটিমিটি হাসতে হাসতে ডাকলেন,

-ভাই একটু এদিকে এসো তো!

-ইয়েস স্যার!

-নাও, চা-টুকু তুমিই খেয়ে ফেলো।

শিক্ষকের আচরণে ফিলিপিনী ভীষণ অবাক!

পরদিন শিক্ষক এলেন যথাসময়ে। না চাইতেই বেয়ারা এক কাপ চা নিয়ে হাজির। চা দিয়ে চলে গেল না। একটু দূরে সংকোচ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিক্ষক জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে বললেন,

-তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে, কিছু বলবে?

-ইয়ে মানে, স্যার যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলতাম!

-ভণিতা ছেড়ে বলে ফেলো!

-স্যারের গতকালের আচরণটা আমাকে ভীষণ অবাক করেছে!

-কোন আচরণটা, বলো তো!

-আমাকে হাসিমুখে চা খেতে দিলেন!

-এই আচরণে অবাক হওয়ার কী পেলে?

-স্যার! আমি মুলুক থেকে সৌদি এসেছি আজ দুই বছর হলো। শুরু থেকেই এই স্কুলে আছি। এতদিন হয়ে গেলো, কেউ একদিনও আমাকে চা খেতে দেয়া তো দূরের কথা! হাসিমুখে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। সবাই আমাকে গোলাম মনে করেই কথা বলেছে। সেভাবেই আচরণ করেছে। ধমক-গোমড়ামুখ আর চোখ রাঙানো ছাড়া কেউ কথা বলেনি! আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রমী সৌদি শিক্ষক।

-তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি! তোমার পড়াশুনা কদ্দূর?

-মাস্টার্স শেষ করেছি।

শিক্ষকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একজন মানুষ তাদের স্কুল ঝাড়ু দিয়ে বেড়াচ্ছে! বিকেলে লোকটাকে সাথে করে বাসায় নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা করার জন্যে বললেন,

-আমার ছেলের পড়াটা একটু দেখিয়ে দিতে পারবে?

-পারবো স্যার!

-সায়েন্সের সব বিষয়? সে অয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়বে, সেভাবেই তার পড়াশুনা এগুচ্ছে! কলেজ ফাইনাল দিবে এবার!

-অংক-ইংরেজী-বিজ্ঞান যে কোনও বিষয়েই আমি সাহায্য করতে পারবো স্যার!

শিক্ষক দেখলেন সত্যি সত্যি তাই। লোকটা সববিষয়েই পাকা। আর পড়ায়ও ভালো। বোঝানোর দক্ষতাও অসাধারণ। সবচেয়ে বড় গুণ মোটেও রাগে না। ধৈর্য ধরে বোঝাতে পারে। লেগে থাকতে পারে। সৌদি শিক্ষক বিষয়টা হেডস্যারের গোচরীভূত করলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন ফিলিপিনী লোকটার জন্যে একটা কিছু করবেন। তাই করলেন। তাদের স্কুলের আরেকটা শাখায় শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন পর ফিলিপিনী লোকটা সৌদি শিক্ষকের বাসায় দেখা করতে এলো।

-কোনও সমস্যা?

-স্যার! একটা কথা বলতে এসেছি!

-জি বলো!

-এদেশে আসার পর সবার আচরণ দেখে মনে করেছিলাম, মুসলমানরা বোধহয় সবাই এমনই হয়। আপনার আচরণ দেখে আমার সে ভুল ভেঙেছে!

-তুমি শুধু আমাদের আচরণটাই দেখলে, তোমাদের দেশের লোকেরা কী সব করে বেড়ায় সেদিকে নজর দাওনি? এমনি এমনি কি আমাদের আচরণ রুক্ষ হয়েছে? প্রথম দিকে আমাদের সবাই তোমাদের সাথে বেশ সুন্দর আচরণ করতো! তোমাদের কৃতকর্মই আমাদেরকে কর্কশ বানিয়েছে। তবে এটাও ঠিক আমাদের কারো কারো আচরণও অমার্জিত। অমানবিক।

-স্যার! আমি গত একমাস যাবত একটা কাজ করেছি! ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে নতুন করে জানার চেষ্টা করেছি!

-খুবই ভালো করেছো!

-আর কিছু বিষয়ে খটকা দূর হলেই আমি মুসলমান হয়ে যাবো।

-অবশ্যই! আমি তোমাকে সাহায্যা করবো। চলো আমাদের দাওয়া সেন্টারে! সেখানে ফিলিপিনের আলেমও আছেন! তিনিই তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারবেন!

জীবন জাগার গল্প : ৫২৮

খারেজী!

কুফায় তখন খারেজীদের দাপট চলছে। চারদিকে তাদের পদচারণা। লোকজন ভয়ে তটস্থ। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-কে দেখা গেলো নির্বিকার! নিরুদ্বেগ। শত ভয়ের মুখেও তিনি আপন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। হক কথা বলে যাচ্ছেন। একদিন খারেজীরা ইমামে আযমকে পাকড়াও করলো।

-শায়খ! কুফুরী থেকে তাওবা করুন!

-আমি সবধরনের কুফুরী থেকে তাওবা করলাম।

খারেজীরা ইমামকে ছেড়ে দিল। তিনি চলে যাওয়ার পর একজন বললো।

-তোমরা যে তাকে ছেড়ে দিলে, তিনি কোন কুফুরী থেকে তাওবা করে গেলেন বুঝতে পেরেছ কিছু?

-কেন আমরা যাদেরকে কাফির মনে করি তাদের থেকে তিনি তাওবা করেছেন! এটা ভেঙে বলতে হবে?

-তা মনে হয় না। তিনি কুফুর বলতে তোমাদের কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন! তাকে আবার ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখো!

-শায়খ! আপনি তো তখন কুফুরী থেকে তাওবা করেছেন?

-জি।

-কুফুরী বলতে কি আপনি আমাদের কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন?

-আপনাদের এমন চিন্তা কোত্থেকে এল? এ প্রশ্নটা কি ধারণাবশত নাকি নিশ্চিত কোনও তথ্যজ্ঞান থেকে?

-না না, নিশ্চিত কিছু নয়। আমরা অনুমান থেকেই প্রশ্নটা করেছি!

-তাহলে শুনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

= হে মুমিনগণ! তোমার অধিকহারে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ (হুজুরাত : ১২)।

যেহেতু ধারণার বশবর্তী হয়েই আমার প্রতি সন্দেহ করেছেন, উক্ত আয়াত অনুসারে আপনি পাপ করেছেন। আপনাদের মতে প্রতিটি পাপই কুফুরী!

তাহলে আপনিই প্রথমে কুফুরী থেকে তাওবা করুন!

-জি শায়খ, ঠিক বলেছেন। আমিই তবে প্রথমে কুফুরী থেকে তাওবা করছি!

এটুকুতে খারেজীরা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা পুনরায় মুনাযারা করতে এলো। কারণ তারা জানতে পেরেছিল, ইমাম সাহেব সাধারণত কা'বাকে কিবলা মানে এমন কাউকে সামান্য গুনাহ করলেই কাফির ফতোয়া দিয়ে বসেন না। তখন ইমাম সাহেব বললেন,

-দেখুন! দুইটা জানাযা এসেছে। মসজিদের দরজায়। একজন ছিল মদদী। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মদের পিপাতে পড়ে ডুবে মরেছে। আরেকজন হলো যেনাকারী মহিলা। গর্ভবতী হয়ে লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। এখন বলুন, দু'জন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলো? ইহুদি?

-জি না।

-খ্রিস্টান?

-জি না।

-মাজুসী (অগ্নিপূজারী)?

-জি না।

-তাহলে কোন ধর্মের? তারা দু'জন কি কালিমায়ে শাহাদাত পড়তো? আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এটা বিশ্বাস করতো?

-জি তা করতো!

-আচ্ছা বলুন তো, কালিমায়ে শাহাদাতটা ঈমানের কতটুকু? এক তৃতীয়াংশ? এক চতুর্থাংশ নাকি এক পঞ্চমাংশ?

-কোনওটাই নয়।

-তাহলে? কতটুকু?

-কালিমায়ে শাহাদাতই পুরোপুরি ঈমান!

-তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের আপত্তিটা কোথায়? তোমরাই তো স্বীকার করে নিলে তারা দু'জনই মুমিন!

-আচ্ছা ঠিক আছে। আপনিই বলুন, তারা দু'জন জান্নাতী না জাহান্নামী?

-তাদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো,

(ক) ইবরাহীম (আ.) উক্ত দু'জনের চেয়ে আরও জঘন্য অপরাধী সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাই,

= ইয়া রাব! নিশ্চয় তারা তো অনেক মানুষকে গোমরাহ করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে সে আমারই দলভুক্ত হবে। আর যে আমাকে অমান্য করেছে (তার ব্যাপারে আমি আর কী বলবো)। আপনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু (ইবরাহীম: ৩৬)!

(খ) আমি উক্ত দু'জন সম্পর্কে নিজ থেকে কিছু বলবো না। ঈসা (আ.) ঐ দু'জনের চেয়েও বড় অপরাধী সম্পর্কে যা বলে গেছেন, সেটাই আমার বক্তব্য,

= যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন (তাহলে দিতে পারেন।) কারণ তারা তো আপনারই বান্দা! আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন (তাহলে করতে পারেন) কারণ আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (মায়িদা: ১১৮)।

(গ) উক্ত দু'জন সম্পর্কে আমি আর কী বলবো। নূহ (আ.) যা বলে গেছেন সেটাই আমার বক্তব্য:

= আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে। একথাও বলি না যে আমি গায়বী খবর জানি। একথাও বলি না যে আমি একজন ফিরিশতা। আর এটাও বলি না, তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত তাদেরকে আল্লাহ তাদেরকে কোনও কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহই ভাল জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হবো (হুদ: ৩১)।

এ পর্যায়ে এসে খারেজীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে বললো:

-আমরা এতদিন যা করেছি তা থেকে তাওবা করছি! আমরা আপনার দ্বীনকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে ইলম হিকমত ও বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন!

জীবন জাগার গল্প : ৫২৯

এক ওয়াক্ত নামায!

আনাস বিন মালিক একটা ঘটনা স্মরণ করে কাঁদতেন। উমর (রা.)-এর খেলাফতকাল। পারস্যের সাথে যুদ্ধ চলছে। বিখ্যাত এক শহরের নাম তসতুর। সুরক্ষিত এক দুর্গ। মুসলমানরা গোটা দেড় বছর এই শহর অবরোধ করে রেখেছিল । তারপর আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন। কঠিনতম এক যুদ্ধ ছিলো।

দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও, দুর্গের প্রধান ফটক কব্জা করা যাচ্ছিল না। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ফজরের ঠিক আগমুহূর্তে সদর দরজা দখল হলো। জোয়ারের পানির মতো ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনী শহরে ঢুকে পড়লো। প্রতিপক্ষ দেড় লক্ষ।

নজিরবিহীন লড়াই হলো। মুসলমানদের জন্যে ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ! দেড়লক্ষ মরিয়া সৈন্যের বিরুদ্ধে, চারদেয়ালের মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া চরম ঝুঁকির একটা কাজ ছিল। পা-জমিয়ে রাখা দুরূহ ছিল।

বিজয় সম্পন্ন হতে হতে সূর্য উঠে গিয়েছিল। ফজর নামায কাযা হয়ে গেল। সঙ্গীন পরিস্থিতিতে 'সালাতুল খাওফ' পড়াও সম্ভব ছিল না। আনাস (রা.) কেঁদে ফেললেন। জীবনে এই প্রথম তার নামায কাযা হলো।

-আপনি তো মা'যুর! জিহাদের মত মহান কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইচ্ছা করলেও নামায পড়া সম্ভব ছিল না। শহরের প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চিতে শত্রু গিজগিজ করছিল!

-জিহাদ তো জিহাদের জায়গায় আছে। কিন্তু এই এক ওয়াক্ত নামাযের জন্যে তো আমি দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করতে পারি।

.

সাহাবায়ে কেরামের বিজয়ের গোপন চাবিকাঠি এখানেই। জিহাদের ময়দানে, অসম্ভব অবস্থায় নামায কাযা করার বিধান আছে! তবুও তাদের এক ওয়াক্ত নামাযের প্রতি কী আকুতি!

শুধু কি নামায! তারা তো তাকবীরে উলাও ছুটতে দিতে নারাজ ছিলেন। তারা আসলে নামাযের ভালোবাসার মাঝে বেড়ে উঠেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই নামাযের ভালোবাসা মনে না বসলে, বড় হলে খুব কষ্ট হয়। সহজে নামাযে মতি হয় না। উন্নতমানের নামায পড়াও হয়ে ওঠে না। দায়সারা গোছের কিছু হয়।

ছেলেবেলাতেই নামাযের ফযীলত শিখিয়ে দেয়া। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব কেমন তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেয়া। নামায না পড়লে আখেরাতে শাস্তিগুলোর কথাও জানিয়ে দেয়া।

পুরষ্কার তিরষ্কার উভয় ভাষাই ব্যবহার করা। সাত বছর থেকেই নামাযে যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ না দিলে, পরবর্তীতে সেটা কঠিন হয়ে যায়। হাদীস মানার মধ্যে বরকত। হাদীসের শিক্ষা হলো, সাত থেকেই সন্তানকে নামাযের প্রতি দাওয়াত দেয়া শুরু করতে হবে। দশের পর থেকে কঠোর হতে হবে!

জীবনের সবক্ষেত্রেই সফল হতে, নামাযের বিকল্প নেই। সাহাবায়ে কেরামের এটাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

সমাপ্ত। আলহামদুলিল্লাহ।